একাধিক বিবাহ

সাইয়েদ হামেদ আলী

একাধিক বিবাহ

[একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা]

সাইয়েদ হামেদ আলী

অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ১৭৫

২য় সংস্করণ

জমাদিউল আউয়াল	১৪১৭
আশ্বিন	১৪০৩
অক্টোবর	১৯৯৬

বিনিময় ঃ ১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

تعدّد ازدواج -এর বাংলা অনুবাদ

EKADHIK BIBAHA by Sayyed Hamed Ali. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 15.00 Only.

সূচীপত্র

বিরোধিতার প্রেক্ষাপট ৫

মূল বিষয় ১১

ভয়াবহ চিত্র ১১

ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ১১

ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ ১২

একাধিক বিবাহ বনাম এক বিবাহ ১৩

একাধিক বিবাহের অনুমতি, না নিষেধাজ্ঞা ১৪

প্রকৃতির সাক্ষ্য ১৬

জীব-জানোয়ারের প্রকৃতি ১৭

মানব-প্রকৃতি ১৯

একাধিক বিবাহ—একটি বিশ্বপ্রথা ২১

একাধিক বিবাহ প্রথা ৩০

সামাজিক ও নৈতিক জটমোচন ৩০

নারীর সংখ্যাধিক্য ৩০

নারীর চিররুগ্নতা ও বন্ধ্যা হওয়া ৩৪

বদ মেজাজ স্ত্রী ৩৫

যোগ্য পাত্রের অভাব ৩৬

এতীম ও বিধবা বিবাহ ৩৬

নারীর স্বাভাবিক অক্ষমতা ৩৮

নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ ৪৯

একাধিক স্বামীত্ব নয় কেনো? ৫২

সুবিচার প্রতিষ্ঠা ৫৮

পরিবার ও বিবাহের স্থায়িত্ব ৬৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিরোধিতার প্রেক্ষাপট

মানবেতিহাসের সর্বাধিক লক্ষণীয় দিক হচ্ছে জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও সম্মিলন। দুটি জাতি যখন পরস্পর মিলিত বা দ্বন্দ্বমুখর হয়, তখন তারা একে অন্যের ওপর প্রভাবশালী কিংবা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরস্পরের ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিনিময় ঘটে। এমনিভাবে এক সভ্যতা আরেক সভ্যতার প্রভাবে ভারাক্রান্ত হয়। প্রভাবান্বিত ও ঐশ্বর্যমন্ডিত হওয়ার এই ধারা যদি কেবল উত্তম-উৎকৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে তা শুধু কল্যাণকর ও কাম্যই হতো না, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের লক্ষ্যে অত্যাবশ্যকীয়ও হতো। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটে, বা ঘটতে দেখা যায়, তা এই যে, ভিন্ন সভ্যতার খারাপ ও গর্হিত জিনিসগুলোও নির্বিচারে আত্মস্থ করা হয়। এ কারবারটি বিশেষভাবে তখনই সংঘটিত হয়, যখন দুটি জাতির মধ্যে একটি হয় শাসক এবং অপরটি হয় শাসিত। শাসিতের হীনমন্যতাবোধ একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। এ হীনমন্যতাবোধ চরমে পৌঁছে যখন শাসক জাতির নিকট সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তি, যুক্তি-প্রমাণের অফুরন্ত ভাণ্ডারও মওজুদ থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারই ঘটেছে।

পাশ্চাত্যের গোলামী করতে গিয়ে প্রাচ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী এবং ভয়াবহ যে ক্ষতিটি হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, প্রাচ্য হীনমন্যতাবোধ ও পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্বের শিকার হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিল্প ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের হাতে শোচনীয় মার খেয়েছিল এবং এই একটিমাত্র কারণই তাদের পরাজিত মানসিকতা ও হীনমন্যতার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো, পাশ্চাত্য ছিল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, নানা রকম আবিষ্কার ও প্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ। আর প্রাচ্য তখন একদিকে যেমন ঐসব জিনিস থেকে বঞ্চিত ছিল, তেমনি তাদের নিজস্ব হাতিয়ারগুলোও ছিলো মরিচা ধরা ও ভোঁতা। ফলে প্রাচ্য বৈষয়িক ক্ষেত্রের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনা ও

তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রেও ইউরোপের নিকট আত্মসমর্পণ করলো এবং নিজস্ব মন-মগজ দিয়ে চিন্তা করার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের রঙিন চশমা দিয়ে সবকিছু দেখতে শুরু করলো। স্বকীয় যুক্তি-বুদ্ধির কথা বাদ দিয়ে ইউরোপের যুক্তি-বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিতেথাকলো।

পাশ্চাত্য দাবী করলো পশ্চিমা সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা। প্রাচ্যের নিকট অজ্ঞতা ও মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রাচ্য নত শিরে তাই মেনে নিল। পাশ্চাত্য বললো, আল্লাহ ও ধর্ম মানুষের কল্পনা থেকে উদ্ভূত। বিজ্ঞান ও সভ্যতার স্বার্থে তাকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। ধর্মভূমি প্রাচ্য বিনা বাক্য ব্যয়ে তাও স্বীকার করে নিল। পাশ্চাত্য বললো, লজ্জা, পর্দা, সতীত্ব, বিবাহ এবং নৈতিক পবিত্রতা সেকেলে ধ্যান-ধারণা। মানুষ একটি জন্তু বিশেষ এবং পাশব প্রবৃত্তির ওপরই তার জীবন-প্রাসাদ রচনা করা উচিত। আর পাশব প্রবৃত্তির দাবী হচ্ছে নরনারীকে অবাধ ও উন্মুক্ত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে দেয়া। সে যার সাথে ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা যৌন-সম্ভোগে লিপ্ত হবে এবং স্বাদ আস্বাদনে যখন তার মন ভরে উঠবে, তখন সব খেলা শেষ করে যেদিকে ইচ্ছা চলে যাবে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের এই পশুবাদও মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিল। মোটকথা, যেসব জিনিস শুধু প্রাচ্য ঐতিহ্যের দৃষ্টিতেই নয়, সর্ববাদী নৈতিক মূল্যমানের বিচারেও চরম গর্হিত বলে বিবেচিত হতো, পাশ্চাত্য প্রভাবে সেগুলোই সভ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও শিষ্টাচার বলে আখ্যায়িত হলো।

এক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা অন্যান্য প্রাচ্য দেশের তুলনায় কিছু মাত্র ভিন্নতর নয়। অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে, এখানে প্রথম থেকেই একটি দল পাশ্চাত্য ভাবধারার বিরোধিতা করে আসছে। কিন্তু নানা কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষিত লোক মানসিক ও চৈন্তিক দাসত্বের শিকারে পরিণত হয়। লর্ড মেকলের পরিকল্পনা অনুসারে চালু করা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল এমন কিছু লোক সৃষ্টি করা, যারা বর্ণ ও গোত্র হিসেবে উপমহাদেশীয় হলেও চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে হবে ইংরেজ। তাদের এই ঔপনিবেশিক কূট-কৌশল যে পূর্ণমাত্রায় সফলকাম হয়েছে, তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ইংরেজের রাজনৈতিক দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গে স্বাধীনতা লাভ করলো। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারার অন্ধ-নিগড় থেকে তাদের আজো মুক্তি ঘটেনি। বরং দিন

দিন তা আরো দৃঢ়তর হচ্ছে। আর এই শৃংখলে উপমহাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার পবিত্র দায়িত্ব (!) আঞ্জাম দিচ্ছে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয় নামক বধ্যভূমির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত এদেশীয়রা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই অন্ধ অনুকরণের ফলেই দেখা গেলো, সে যখন ইসলামের বিবাহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি করলো, তখন তার এদেশীয় অন্ধ অনুসারীরা ইসলামের বিবাহ ব্যবস্থার ত্রুটি–বিচ্যুতি আবিষ্কার করতে শুরু করলো। তারা একাধিক বিবাহ প্রথাকে মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করলো। কিন্তু একাধিক বিবাহ কোন্ দিক দিয়ে দোষণীয়, পাশ্চাত্যের অন্ধ দাসত্ব তাদেরকে তা চিন্তা করার অবকাশ দেয়নি। পাশ্চাত্যবাসীরা তাদের সমাজ জীবন বিশেষ করে যৌন জীবন যে পাশব প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, একাধিক বিবাহ ব্যবস্থা কি তার পরিপন্থী? নিশ্চয়ই নয়। বরং পাশব প্রকৃতি তার পূর্ণ সমর্থনকারী। তার একাধিক বিবাহ প্রথা কি মনুষ্যত্ব বিরোধী? না, তাও নয়। এক বিবাহের পক্ষপাতীদের মত অনুসারে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে বহু বিবাহপ্রবণ এবং আইনগত বিধিনিষেধ সত্ত্বেও পশ্চিমা দেশসমূহ থেকে এই প্রবণতা উচ্ছেদ করা যায়নি। বরং তা বিকৃত হয়ে অবাধ ও উন্মুক্ত যৌনতার রূপ ধারণ করেছে। একাধিক বিবাহ নারীর ওপর যুলুম বলেই কি তা খারাপ ও পরিত্যাজ্য? নিজের স্বামীর ভালবাসার অংশীদার অন্য একটি মেয়ে হবে, এটা কোনো মেয়ে পছন্দ করে না। কিন্তু এক বিবাহ প্রথা তার চাইতেও মারাত্মক যুলুমের কারণ হয়ে থাকে। এক বিবাহের কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারে কিংবা নিজের সহধর্মিণী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং তার জন্য শুধু টাকা পয়সাই নয়–নিজের অন্তর নিংড়ানো ভালবাসা উজাড় করে দিতে পারে। একাধিক বিবাহ কি সভ্যতা ও নৈতিকতাবিরোধী? ইতিহাস সাক্ষী, একাধিক বিবাহ প্রথা প্রতি যুগে এবং বর্তমান নৈতিকতা বিরোধী পাশ্চাত্য সভ্যতা ছাড়া প্রত্যেক সভ্যতায়ই সর্বদা স্বীকৃত ছিল। এবং তা কোনো সময়ই দোষণীয় বিবেচিত হয়নি (ইউরোপে বহু বিবাহ প্রথা ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল এবং চার্চ ও রাষ্ট্র উভয়ই তার বৈধতা স্বীকার করেছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, অষ্টাদশ খন্ড, polygamy দ্রষ্টব্য)। তাতে চরিত্রহীনতার এমন প্রবাহ সৃষ্টি হয়নি, যা আইনগতভাবে এক বিবাহ প্রথা জারী করার পর ইউরোপে সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া

যারা একাধিক নারীর সাথে অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে সঙ্গত মনে করে, এতে দোষের কিছু দেখে না, তারা কোন্ মুখে একাধিক স্ত্রীর সাথে বৈধ সম্পর্ক স্থাপনকে দোষণীয় মনে করছে? একাধিক বিবাহ প্রথা কি এজন্য খতম করে দিতে হবে যে, তাতে অর্থনৈতিক জটিলতা দেখা দিয়েছে বা দিচ্ছে? যদি তাই হয়, তবে এক বিবাহ প্রথার আইনগত ঘোষণা তারও আগে খতম হওয়া উচিত। কেননা, এতে ইউরোপীয় দেশসমূহ অনেক দুরপনেয় চারিত্রিক জটিলতার শিকার হয়ে পড়েছে, যার ফলে খোদ পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মহল এখন বহু বিবাহ প্রথার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। একাধিক বিবাহ কি এজন্য অবৈধ যে, এটা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী? আমাদের জানা মতে পারিবারিক জীবন সমর্থনকারী কোনো ধর্মই একাধিক বিবাহ প্রথাকে হারাম জ্ঞান করে না—এমনকি খৃস্টান ও হিন্দু ধর্মও নয়।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে একাধিক বিবাহের অনুমতি রয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ, ২১ অধ্যায়, ১৫ আয়াত)। বনী ইসরাঈলের বিশিষ্ট লোকেরা একাধিক বিবাহ করেছেন। নিউ টেস্টামেন্টে (ইনজীল) হযরত ঈসা (আ) কিংবা সেন্টপলের তরফ থেকেও তার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়নি। বরং সেখানে যেসব কথাবার্তা রয়েছে, তাতে একাধিক বিবাহেরই অনুমতি পাওয়া যায় (নিউ টেস্টামেন্ট, তিমথীয়, তৃতীয় অধ্যায়, ২ এবং ১২ আয়াত)। অতএব্ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ঈসায়ী চার্চ একাধিক বিবাহকে বৈধ বলে স্বীকার করেছে। হিন্দুদের ধর্মীয় বিধানের মৌলিক গ্রন্থ মনু সংহিতায়ও একাধিক বিবাহ সম্পর্কে স্পষ্ট অনুমতি বরং উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় (নবম অধ্যায়, ৮০–৮২ শ্লোক) এবং ধর্মভীরু মনীষিগণ নিরন্তর একাধিক বিবাহের প্রবক্তা ও অনুসারী ছিলেন। অবশ্য সাধু–সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা। তারা শুধু বহু বিবাহই নয়, বৈবাহিক জীবনরেই ঘোর বিরোধী। তারা কোনো নারীকে, তিনি মাতা কিংবা ভগ্নীই হোন না কেনো—চোখে দেখা এবং তার সামনা—সামনি হওয়ারই পক্ষপাতী নন। শুধু নারী নয়, তারা সভ্য দুনিয়ার মুখ দেখা এবং শুধু যৌন স্বাদই নয়, দুনিয়ার যে কোনো নিয়ামতেরই স্বাদ আস্বাদন হারাম মনে করেন। স্পষ্টতই সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে এদের মতামতের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু তবু যদি কেউ নিছক এটাকেই আধ্যাত্মিকতা মনে করতে থাকে, তবে এরূপ আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তার বনে চলে যাওয়া উচিত। আর দুনিয়া ও তার যাবতীয় কাজকর্ম আমরা দুনিয়াদারদের হাতেই ছেড়ে দিতে চাই।

একাধিক বিবাহ সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এ বিষয়টির বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিই ছিল না। ব্যাপারটি এমনও ছিল না যে, সুদীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা, বহু বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা বহু বিবাহ প্রথাকে সমাজ জীবনের পক্ষে অনিষ্টকর বলে সাব্যস্ত করেছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, একাধিক বিবাহ প্রথাকে পাশ্চাত্যবাসীরা শুধু অনভিপ্রেত বলেই উল্লেখ করেছিল এবং এটাকে তারা নিছক একটি অভদ্রজনোচিত কাজ বলে মনে করতো। মানসিক গোলামীতে নিমজ্জিত লোকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। অতএব, তারা পাশ্চাত্যের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পারস্য কবি শেখ সাদীর ভাষায়—

রাজায় যদি দিনকে বলে রাত

পারিষদ বলে, ঐ তো তারা, ঐ তো চাঁদ।

একাধিক বিবাহ প্রথার প্রাচ্য দেশীয় বিরোধীদের মধ্যে যারা আল্লাহ বা ইসলাম বিরোধী ছিল, তারা এটাকে বিলাসিতা ও কামলিপ্সা বলে অভিহিত করলো। অথচ একবিবাহের ধারক পাশ্চাত্য সভ্যতা খোদ নিজেই ছিল বল্গাহীন বিলাস-ব্যসন ও কামজবৃত্তির প্রতিমূর্তি। এমন কি এই কামজবৃত্তিকে এই সভ্যতার ধ্বজাধারীরা এতটুকু গোপন করেও রাখতো না।

যারা পাশ্চাত্য প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করতে প্রস্তুত ছিল না, তারা ইসলামী শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়—যেগুলোরবিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের অভিযোগ ছিল—এ বিষয়টিরও অপব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো। কেউ বললো—বহু বিবাহের শিকড় ছিল প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত। তাই মহান ইসলাম তাকে পরোক্ষ ও ক্রমান্বয়ে বিলোপ করতে চেয়েছে। সুতরাং আজ যদি এই প্রথাটিকে আইন করে বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে তা পূর্ণ ইসলামসম্মতই হবে। কেউ বললো—বহু বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছিল ইয়াতীমদের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধানকল্পে। অতএব, এ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এটাকে ব্যবহার করা ঠিক নয়। অন্য কেউ বললো—আল কুরআন একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার শর্ত সাপেক্ষে। কিন্তু স্বয়ং আল কুরআনেরই আরেকটি আয়াত স্পষ্ট উল্লেখ করেছে যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা মানুষের

সাধ্যাতীত ব্যাপার। অতএব, সঠিক অর্থে ইসলাম আক্ষরিকভাবে না হলেও ভাবগত ও কার্যত একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তাদের এসব অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্য ছিল একাধিক বিবাহ নামক আল্লাহর বিধানটিও বাতিল করা আর পবিত্র ইসলামের সাথে নিজেদের সম্পর্কটাও টিকিয়ে রাখা।

মূল বিষয়

ভয়াবহ চিত্র

আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী একাধিক বিবাহের চিত্র অঙ্কন করেন এভাবেঃ এক একজন পুরুষের চারপাশে .ডজনকে ডজন স্ত্রীলোক তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও কামজবৃত্তি চরিতার্থের জন্য জমা করা হয়েছে। এদের ওপর এই স্ত্রীলোকদের কি কি অধিকার বর্তায় এবং এই এক দঙ্গল স্ত্রীলোকের গর্ভে যে পালে পালে সন্তান জন্ম নেবে, তাদের অবস্থাই বা কি হবে এ নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তাদের কাজ কেবল দুটিই। নিজেদের চারিপাশে বিপুল সংখ্যক নারী জমা করা এবং রাত-দিন কামজবৃত্তি পরিতৃপ্ত করা ও ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা। এই চিত্রে রং লাগানোর জন্য ইন্দ্রিয়সেবী নবাব ও প্রবৃত্তিপূজারী রাজা-বাদশাহদের পেশ করা হয়। দেখো! অমুক অমুক বাদশাহর হেরেমে শত শত, হাজার হাজার নারী ছিল। আফ্রিকার উগান্ডার এক রাজা এবং কঙ্গোর আরেক রাজার সাত হাজার স্ত্রী ছিল। এ হচ্ছে এ বিষয়ের সবচেয়ে বড় রেকর্ড (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৮ খন্ড, শব্দ Polygyny. এডিশন -১৯৫৯ খৃঃ)। বলা হয়ে থাকে, এই রাজা-বাদশাহরা তাদের প্রতিটি স্ত্রীর সাথে জীবনে মাত্র একবারই রাত যাপন করতেন এবং পরবর্তী বাসর কাটাতেন অন্য এক স্ত্রীর সাথে। নিঃসন্দেহে এ কল্পচিত্র অতি নির্মম ও ভয়াবহ। কিন্তু সীমিত ও শর্তসাপেক্ষ একাধিক বিবাহের সাথে এর কি সম্পর্ক? এতো হচ্ছে রাজ-রাজড়াদের ভোগ-বিলাসের লীলাখেলা! স্বৈরাচারী রাজা-বাদশাহর প্রকৃত কোনো ধর্ম থাকে না—তা তারা নিজেদেরকে যতই ধর্মের অবতার বলে দাবী করুক না কেনো। তাদের কোনো নীতি-নৈতিকতারও বালাই নেই। একাধিক বিবাহ প্রথা বলুন, আর একবিবাহের আইন—কোনো কিছুই তাদের ভোগ-বিলাসের কাছে পাত্তা পায় না। ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহীরুদ্দীন বাবর তাঁর সতীর্থদের কি চমৎকার চরিত্র অঙ্কন করেছেন—"বাবর, ভোগ করে নাও, জীবন দু'বারআসবেনা।"

ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা

সত্য কথা বলতে কি, ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সাথে একাধিক বিবাহ প্রথার কোনো সম্পর্ক নেই। বল্গাহীন শাসনকর্তারা তাবৎ আইন-কানুনই ভঙ্গ করতে পারে। আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আসর তারা নিয়তই গুলজার

করতে পারে। গুলজার করেও থাকে অহর্নিশ। আর যাদের অন্তঃকরণে ধার্মিকতা ও আল্লাহ ভীতির লেশ মাত্র নেই, কামদেবতা যাদের কাঁধে সওয়ার হয়ে আছে, একাধিক-বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পরকীয়া প্রেমে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতে তাদের এতটুকু বাধে না। তারা রক্ষিতাও রাখতে পারে। পতিতালয়েও যেতে পারে। পুরাতন স্ত্রী তালাক দিয়ে নতুন নতুন ললনা দ্বারাও ইন্দ্রিয় সুখ মিটাতে পারে। আর এ কারণেই দেখা যায়, একাধিক বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা দেশগুলোতে এসবকিছুই অবাধে সংঘটিত হচ্ছে।

ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ

ভোগ-বিলাস ও কামপরায়ণতার অভিযোগ নিছক সেই সব ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার ওপরই বর্তে, যা কোনোরূপ সীমা-শর্ত ব্যতিরেকেই বহুবিবাহ প্রথার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু ইসলামের ওপর এ অভিযোগ কস্মিনকালেও অর্পিত হতে পারে না। কেননা, ইসলাম উর্ধপক্ষে একসাথে চারটি বিবাহ বন্ধনের অনুমতি দান করে মাত্র। আর তাও এমন কঠিন শর্তসহ যে, সদা-সর্বদা সকল স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে (দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মমতগুলো একাধিক বিবাহের প্রতি প্রকাশ্যে কিংবা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করলেও তার ওপর কোনো সীমা-সংখ্যা বা শর্ত আরোপ করে না)। শুধু তাই নয়, ইসলাম দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনসহ গোটা মানব জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহভীতি, সুবিচার, লজ্জাশীলতা ও নৈতিক পবিত্রতার ওপর। ইসলাম এ দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান করে। পরকালীন সফলতাকে মানব জীবনের পরমতম লক্ষ্য বলে স্থির করে এবং এজন্য সে তাকওয়া ও পবিত্রতাকেই মৌল শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করে।

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَّالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا (نساء : ٧٧)

"বলো, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ক্ষণ-পরিমাণ, (তারচে') সাবধানী লোকের জন্য পরকাল অনেক উত্তম আর তোমাদের ওপর এতটুকু অবিচার করা হবে না।"
-(সূরানিসাঃ৭৭)।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ *

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ * (مومنون : ١ ، ٢ ، ٤)

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিন বান্দারা, যারা বিনয়-নম্রভাবে সালাত আদায় করে। যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত দানে সদা-সক্রিয়। আর যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংরক্ষণ করে।"

(সূরাঃ মুমিনুন,ঃ১-৫)

বলা বাহুল্য, আল-কুরআনের এসব ঘোষণার প্রেক্ষিতেই নবী মুস্তফা (স) এরশাদকরেছেন-

مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ (بخارى ومسلم)

"যে ব্যক্তি আমাকে তার কণ্ঠ ও যৌনাঙ্গ সম্পর্কে (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ থেকে বিরত রাখার) গ্যারান্টি দিতে পারবে, তাকে আমি জান্নাতের গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত।"-(বুখারী ও মুসলিম)

রসূলে আকরাম (সঃ) আরো বলেছেন-

لَعَنَ اللّٰهُ الذَّوَّاقِيْنَ وَالذَّوَّاقَاتِ (ارشاد نبوى)

"যেসব নরনারী সদা নতুন নতুন ভোগ-লালসা অন্বেষণ করে বেড়ায় (তা যতই আইনসম্মত হোক না কেনো) আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন।"

ইসলামের নৈতিক মূল্যমান যেখানে এতখানি পবিত্র, সেখানে তার একাধিক বিবাহের অনুমতি কি করে কামোদ্দীপক ও কামপ্রবণ হতে পারে?

একাধিক বিবাহ বনাম একবিবাহ

কেউ কেউ বিষয়টির ওপর আলোচনা করতে গিয়ে একাধিক বিবাহ প্রথাকে একবিবাহের সাথে তুলনা করেন। তারা আদাপানি খেয়ে প্রমাণ করতে চান যে, একবিবাহ প্রথা অতি উত্তম, অতি সংস্কৃত এবং অতি প্রগতিশীল। পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণই হচ্ছে এ পথের অগ্রপথিক। যদিও সেখানে এটা এখন পর্যন্ত স্থির হয়নি যে, একবিবাহ প্রথা নিরন্তরই একাধিক বিবাহ অপেক্ষা উত্তম। পাশ্চাত্যে এখনো বহু

চিন্তাবিদ আছেন, যারা একাধিক বিবাহ প্রথাকে এক বিবাহ অপেক্ষা অনেক উত্তম ও অধিক স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান করেন। প্রখ্যাত যৌন বিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis)-যিনি এক বিবাহকে একাধিক বিবাহ অপেক্ষা উত্তম মনে করেন—তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Studies in the Psychology of sex-এ এযুগের কয়েকজন পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করেছেন। যারা একাধিক বিবাহ প্রথার জোর সমর্থক এবং তাকে একবিবাহ অপেক্ষা অনেক ভালো ও মানব প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি বলে মন্তব্য করেছেন।

একাধিক বিবাহের অনুমতি, না নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন আসলে এ নয় যে, একবিবাহ প্রথা অধিক ভালো, না একাধিক বিবাহ পদ্ধতি। হতে পারে একবিবাহ পদ্ধতিই বেশী ভালো। কিংবা কখনো এক বিবাহ প্রথা বেশী ভালো আবার কখনো একাধিক বিবাহ প্রথা। প্রশ্ন শুধু এই যে, একবিবাহ প্রথার পাশাপাশি একাধিক বিবাহ প্রথাও বহাল থাকতে দেয়া হবে—যেমনটি এতদিন ছিলো অথবা তাকে আইনত নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে? যদি উত্তর আইনগত নিষেধাজ্ঞার সপক্ষে হয়, তাহলে একবিবাহ প্রথা একাধিক বিবাহ অপেক্ষা উত্তম একথার কোনো তাৎপর্যই থাকে না। কেননা, বেছে বেছে শুধু ভালো ভালো জিনিসগুলোকেই বৈধ রাখা হবে, আর অপেক্ষাকৃত কম ভালো জিনিসগুলোকে অবৈধ-অসিদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হবে- সমাজে আইনের ভূমিকা তা নয়। আইন আদর্শ লোকদের জন্য নয়—সাধারণ মানুষের জন্য। আর সাধারণ মানুষ থেকে আপনি কখনও আদর্শ আচরণ আশা করতে পারেন না। সমাজের সর্বাত্মক উন্নতি, সকল প্রয়োজন পূরণ এবং বিভিন্ন শ্রেণী, স্তর ও ব্যক্তিবর্গের সাথে সুবিচার-সদ্ব্যবহার নির্ভর করে সমাজের আইন- কানুনে সাধারণ মানুষের সহ্যশক্তি ও ধারণ ক্ষমতার প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখা হয়েছে তার ওপর। উচ্চতর এবং আদর্শ কর্মকান্ড ছাড়া নিম্নমানের মূল্যবোধগুলোকেও আইনানুগ ও বিধিবদ্ধ রাখতে হবে। পাশ্চাত্যের আইন-কানুনসহ দুনিয়ার তাবৎ আইন-কাঠামো এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সংগঠিত।

যারা একাধিক বিবাহকে আইনত নিষিদ্ধ করার দাবীদার, একাধিক বিবাহের কুফল সম্পর্কে তাদের সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করা উচিত এবং একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিলে ঐ আপদগুলো সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যাবে, আর নতুন কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হবে না—তাদের তাও প্রমাণ করা উচিত। পক্ষান্তরে যারা সীমিত ও

নিয়ন্ত্রিত একাধিক বিবাহের পক্ষপাতী, তাদেরও তার সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন করা কর্তব্য। সাথে সাথে প্রতিপক্ষের জবাব এবং একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হলে সমাজে তার কি কি কুফল দেখা দিতে পারে, তাও তাদের তুলে ধরা উচিত।

প্রকৃতির সাক্ষ্য

এযুগের চিন্তাবিদগণ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির ওপর বুনিয়াদী গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাঁদের মতে, যা প্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধ, তা নির্দ্বিধায় ঝেড়ে ফেলা উচিত। ইসলামের বিধি-বিধানও মানব প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ (روم : - ٣٠)

"(তোমরা) আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সহজ-সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা রূমঃ৩০)

পাশ্চাত্যবাসীরা প্রকৃতি বলতে মূলত জীব-প্রকৃতিকেই বুঝেন। তারা জীব-জীবন সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকেন। এসব গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানে তারা একটা সাধারণ সূত্র আবিষ্কারে সচেষ্ট হন এবং সেটাকে মানব জীবনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। যৌন ব্যাপারে তো তারা বিশেষ করে জীবধর্ম বা জীব-প্রকৃতি হতেই নির্দেশনা লাভ করে থাকেন। সৌভাগ্য বলুন, আর দুর্ভাগ্য বলুন, যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থের বিষয়টি মানব ও মানবেতর প্রাণী উভয়ের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। একবিবাহ, একাধিক বিবাহ, খান্দান ও অন্যান্য বৈবাহিক ও পারিবারিক বিষয়াদি পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণ জীবজন্তুর স্বভাব-প্রকৃতির আলোকে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে (Physics) সত্য বলে স্বীকার করা অতপর এই নিপট-নিরেট জড়বাদকে মানুষের সমাজ জীবন (Social life) ও সমাজ বিজ্ঞানে (Social Sciences) প্রয়োগ করার পর স্বতসিদ্ধভাবেই এই সাধারণ বিধি স্থিরীকৃত হয় যে, যখন জন্তু-জানোয়ারই আমাদের বাপ-দাদা বলে স্বীকৃত এবং আমাদের শিরা-উপশিরায় তাদেরই শোণিতধারা প্রবহমান, তখন আমাদের সকল কর্মকান্ডে জন্তু-জানোয়ারই আদর্শ হওয়া উচিত। আসুন, পাশ্চাত্যবাসীদের এই কষ্টিপাথরে আমরা একাধিক বিবাহের বিষয়টি যাচাই করে দেখি।

জীব–জানোয়ারের প্রকৃতি

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ লেটুরনিউ তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ "বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ"–এ 'জীব–জন্তুর মধ্যে বিবাহ ও পরিবার' শীর্ষক আলোচনায় প্রাণীদের রকমারি যৌনক্রিয়ার ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এখানে তার কয়েকটি উধৃতি তুলে ধরছিঃ

"কিন্তু এ জিনিস বিশেষ করে পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। এদের মধ্যে আমরা এমন সব সম্পর্ক–সম্বন্ধ লক্ষ্য করি, যা অনেকটা মানুষের মধ্যকার বিবাহ ও পরিবারের সাথে তুলনীয়।..... মানুষের মত পাখীরাও কোনো কোনো সময় যৌন–স্বাধীনতা (Promiscuity) ভোগ করে থাকে—কখনো একবিবাহ আবার কখনো বহুবিবাহের মাধ্যমে। বন্য হাঁসরা বনে একবিবাহকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু গৃহপালিত হওয়ার পর তারা বহুবিবাহতেই অভ্যস্ত হয়। একই অবস্থা গিনি ফাউলেরও (Guineafowl)।"–পৃঃ২৫ (গিনি ফাউল এক জাতীয় পাখী–নিবন্ধকার)

"পাখীদের অন্যান্য প্রজাতি—যারা অবাধ যৌন প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করেছে—এখনো বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রথা আঁকড়ে ধরে আছে। গেলিনেসাস (Gallinaces-পাখী বিশেষ) দাম্পত্য জীবনের এই প্রক্রিয়াটি (একাধিক স্ত্রী গ্রহণ) বড়ই পছন্দ করে–যে-প্রক্রিয়াটি মানব জাতির মধ্যে বহুল প্রচলিত, এমনকি সভ্যতার এই উত্তুঙ্গ স্তরে পৌঁছে যখন মানুষ একবিবাহ প্রথাকেই সেরা প্রথা হিসেবে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছে, তখনো আমাদের গোলাঘরের দেউড়িতে বসবাসকারী পাখীগুলো স্বাধীনচেতা, ইন্দ্রিয়সেবী, অহংকারী ও বহুস্ত্রী গ্রহণকারী পাখীদের জ্বলন্ত নিদর্শন হয়েআছে।"–(পৃঃ ৩১)

"কিন্তু বহুবিবাহের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। এটি স্তন্যপায়ী জানোয়ারদের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত—বিশেষ করে সমাজ ও দলবদ্ধ জীব–জানোয়ারদের মধ্যে।"–(পৃঃ ৩১)

"বানরদের চরিত্রে কিছুটা বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। তাদের কেউ কেউ একাধিক স্ত্রী ভালোবাসে, আবার কেউ কেউ একস্ত্রী।..... মানুষেরআকৃতিবিশিষ্ট একজাতের বানর আছে—তারা কখনো একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে, আবার কখনো একস্ত্রী। বনমানুষ সূত্রে প্রকাশ, গোরিলা জিনা নামক এক শ্রেণীর বনমানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বাস করে। প্রতিটি দলে সাবালক পুরুষ থাকে মাত্র একজন। সে

একাধিক স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির সর্বাধিনায়ক। শিম্পাঞ্জী বনমানুষের আরেকটি প্রজাতি। এরা কোনো কোনো সময় বহুস্ত্রী গ্রহণ করে। আবার কোনো কোনো সময় একস্ত্রী" -(পৃঃ ৩৩)

"এ বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, জীব-জানোয়ারের বেলায় যৌন-প্রক্রিয়া অনায়াসেই পরিবর্তিত হতে পারে। প্রাণী জগতের কোনো প্রজাতিই অনিবার্য ও স্থায়ীরূপে কোনো বিশেষ যৌন প্রক্রিয়ার অনুসারী নয়। আজকে যে প্রাণীটি একস্ত্রীর পানি গ্রহণ করছে, আগামী কাল সে-ই নির্দ্বিধায় একাধিক স্ত্রী বরণ করতে পারে। মোটের ওপর কোনো বিশেষ প্রজাতির চিন্তা-চেতনা ও যৌন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিধৃত নয়।" -(পৃঃ ৩৬)

উপরোক্ত উধৃতিসমূহ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেঃ

(১) জীব-জন্তুর মধ্যে একস্ত্রী প্রথাও চালু আছে এবং বহুস্ত্রী প্রথাও।

(২) যেসব প্রাণী সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে, তাদের মধ্যে বহুস্ত্রী প্রথা বহুল প্রচলিত।

(৩) বন্য জীবনে কোনো কোনো প্রাণী একস্ত্রী প্রথায় অভ্যস্ত হয়। কিন্তু শহুরে জীবন অবলম্বনের পর তারা বহুস্ত্রী প্রথা বরণ করে নেয়। যেন সভ্য জীবনের সাথে বহুবিবাহের সম্পর্ক-সম্বন্ধ ওতপ্রোত।

(৪) যেসব জীব-জানোয়ার মনুষ্য-সদৃশ, তাদের মধ্যে বহুস্ত্রী প্রথাও চালু আছে, আবার একস্ত্রী প্রথাও। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রজাতি নিছক বহুস্ত্রী প্রথাই ধারণ করে আছে।

(৫) বহুস্ত্রী প্রথা হোক, আর একস্ত্রী প্রথা—কোনো প্রজাতিই চিরন্তন ও অনিবার্যরূপে কোনো বিশেষ ধারার অনুসারী নয়।

(৬) জীব-জানোয়ারের চিন্তাধারা ও যৌন প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো বিশেষ সম্পর্ক বিধৃত নয়। চিন্তার ক্ষেত্রে নীচু স্তরের প্রাণীর মধ্যে একস্ত্রী প্রথা প্রচলিত, আর উঁচু স্তরের প্রাণীদের মধ্যে বহুস্ত্রী প্রথা।

এই সাধারণ সূত্রগুলো মানব জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখলে নিম্নোক্ত ফলাফল বেরিয়েআসেঃ

(১) মানব সমাজে একবিবাহের সাথে সাথে একাধিক বিবাহ প্রথাও চালু থাকা স্বাভাবিক।

(২) মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই স্বভাবতই একাধিক বিবাহের প্রতি তাদের ঝোঁক থাকবে।

(৩) মানুষ একবিবাহ প্রথাই গ্রহণ করুক, অথবা একাধিক বিবাহ প্রথা—কোনোটাই স্বভাব বিরুদ্ধ নয়।

(৪) একাধিক বিবাহ প্রথা নির্বুদ্ধিতা ও কৃষ্টিহীনতার স্বাক্ষর বহন করে না।

এ ফলাফলগুলো এতই স্পষ্ট যে, একবিবাহ প্রথার সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থকার একাধিক বিবাহের আলোচনা নিম্নোক্ত ভাষায় শুরু করেছেনঃ

"আমরা দেখতে পাই যে, জীব-জন্তুর মধ্যে কোনো কোনো প্রজাতি একস্ত্রী বিশিষ্ট হয়, আবার কোনো কোনো প্রজাতি বহুস্ত্রীর পক্ষপাতী। মানুষ নিসন্দেহে প্রাণী জগতের মধ্যে সবচেয়ে মিশুক ও সামাজিক জীব। তাই বহুবিবাহ প্রথার প্রতি তাঁর ঝোঁক-প্রবণতা বেশী। ঠিক মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট বৃহৎ প্রজাতির বানরের মতই। অবশ্য তাদের সাথে আমাদের পূর্বসূরীদের একাধিক সাদৃশ্য ছিলো কিনা কে জানে।"-(পৃঃ১২৩)

মানব-প্রকৃতি

এই উধৃতি থেকে আরো একটি জিনিস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, জীবজন্তুর কথা বাদ দিলেও খোদ্ মনুষ্য সমাজই স্বভাবগতভাবে একাধিক বিবাহের প্রতি বেশী আসক্ত। একবিবাহ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার এসত্যটিকেই নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীকার করে নিয়েছেনঃ

"পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই একাধিক বিবাহপ্রিয়। কিন্তু অনেক সময় সে সমাজ-সমষ্টির প্রয়োজনীয়তার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়।"-(পৃঃ ১৭৩)

লর্ড মোরলে-ও (Morley) এই অভিমতই ব্যক্ত করে বলেছেনঃ "পুরুষ লোক স্বভাবতই একাধিক স্ত্রী গহণে আগ্রহী।" কিন্তু হ্যাভলক এলিস এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। লর্ড মোরলের অভিমত উধৃত করে তিনি বলেনঃ

"এই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা যদি আমরা এভাবে করি যে, পুরুষ লোক প্রকৃতিগতভাবে একস্ত্রীপ্রিয়; কিন্তু একই সাথে সে শ্রেণীগত বৈচিত্র্যের প্রতিও সমান উৎসাহী, তাহলে এর সপক্ষে বহু যুক্তি আছে।"-(Studies in The Psychology Of Sex. Vol. ii Part iii, p. 495)।

এই দৃষ্টিকোণ ও মনোভঙ্গীর সার কথা হচ্ছে, পুরুষ লোক একাধিক স্ত্রীর আকাংখী। একাধিক বিবাহ প্রথা যে একান্তভাবেই স্বাভাবিক ও প্রকৃতিসম্মত একজন যৌন বিশেষজ্ঞের তরফ থেকে এটা তারই পরোক্ষ স্বীকৃতি।

যৌন বিজ্ঞানী জর্জ রিলে স্কট বলেনঃ

"পুরুষ জাতি মূলগতভাবেই একাধিক বিবাহের প্রতি উৎসাহী, আর সভ্যতার ক্রমবিকাশ এই একাধিক বিবাহের উৎসাহকে আরো বাড়িয়ে তোলে।" (History Of Prostitution, P.21)

ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা স্বাধীনচেতা দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'বিবাহ এবং নৈতিকতা'য় (Marriage And Morals) পরিষ্কার উল্লেখকরেছেনঃ

"আমার মনে হয়, স্বাধীন সভ্য মানুষও—পুরুষ হোক আর নারী—প্রকৃতিগতভাবে একাধিক বিবাহের প্রতি আগ্রহী। সে কিছু কালের জন্য একব্যক্তির প্রেমে ডুবে যেতে পারে, আর ডুবে যায়ও বটে, কিন্তু দ্রুত হোক আর বিলম্বে হোক, তার এই বৈচিত্রহীন যৌন সম্পর্ক প্রেমের গভীরতা হ্রাস করে দেয় এবং আদিম প্রবৃত্তি চাঙ্গা করার জন্য সে অন্য কারো প্রতি ঝুঁকে পড়ে। নৈতিকতা সংরক্ষণকল্পে এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও একে সর্বতোভাবে নির্মূল করা অসম্ভব। নারী স্বাধীনতার যতই বিকাশ লাভ ঘটছে, যৌন অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুযোগ কল্পনাকে স্ফীত করে—কল্পনা স্ফীত করে কামলিপ্সাকে। আর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ মতে, অগ্র-পশ্চাতের অনুপস্থিতিতে কামলিপ্সা নির্বিঘ্নে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।"-(পৃঃ ১৩৯)

ডক্টর রোমল্যান্ডো (Rom Landoau) আরো পরিষ্কার ও জোরালো ভাষায় বলেছেনঃ

"একটি অপূর্ণাঙ্গ দুনিয়ায়—যে ধরনের দুনিয়ায় আমরা বসবাস করছি—একাধিক বিবাহ প্রথাকে স্বাভাবিকভাবেই বৈধ ও সিদ্ধ বলে স্বীকার করতে হবে। একাধিক বিবাহ প্রথাকে পুরাপুরি খতম করতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে গোটা সভ্যতার কার্যক্রম বদলে দিতে হবে। তারপর বদলে দিতে হবে পুরুষ জাতির প্রকৃতিকে এবং সবশেষে স্বয়ং প্রকৃতিকে।"-(Sex, Life, And Faith, P.186)

একাধিক বিবাহ—একটি বিশ্বপ্রথা

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও একাধিক বিবাহ করার অনুমতি ছিলো না। কিছু লোক সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা একবিবাহ প্রথায় বিশ্বাসী ছিলো। কিন্তু আমাদের কাছে সে সব তথ্য মওজুদ আছে, তাতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা মুশকিল যে, একবিবাহ একটি চিরন্তন রীতি, একটি নৈতিক আদর্শ এবং একটি সুরক্ষিত আইন।"–(পৃঃ ৯৪৯, সংস্করণ–১৯৫৯ ঈঃ)

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার অষ্টাদশ খন্ডে 'বহুবিবাহ' শীর্ষক আলোচনায় বিষয়টি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমন 'অল্পশিক্ষিত সমাজ' (Lower Culture Groups) উপশীর্ষকে বলা হয়েছেঃ

"অশিক্ষিত সম্প্রদায়—যেমন শিকারজীবী নিম্নশ্রেণীর লোক (Lower Hunters) এবং যাযাবরদের মধ্যে বহুবিবাহের রীতি বড় একটা চোখে পড়ে না—কতিপয় অস্ট্রেলীয়ান ও বন্য উপজাতি ব্যতীত। অনুরূপভাবে আদিম কৃষিজীবী এবং অন্তত তাদের মধ্যে গন্ডমূর্খের দলে বহুবিবাহের প্রচলন বিস্তৃত নয় (অর্থাৎ বহুবিবাহের রীতি তাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো—তবে ব্যাপক আকারে নয়—নিবন্ধকার)।.....পক্ষান্তরে শিকারজীবী উচ্চ শ্রেণীর (Higher Hunters) মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন অত্যধিক। সমাজবদ্ধ লোকের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে একবিবাহ প্রথাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। শিকারজীবী ও আদিম কৃষিজীবী ছাড়া উচ্চ শ্রেণীর কিষাণদের (Higher Agriculturists) মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন অতি ব্যাপক।...মূলত বহুবিবাহের ব্যাপকতা সম্পর্কে যে–সব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, আফ্রিকাবাসীদের মধ্যেই তা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিলক্ষিত হয়।..... বহুবিবাহের প্রচলন আফ্রিকায়ই প্রকটতর–ব্যাপকতার দিক থেকেও, আর স্ত্রীসংখ্যার দিক থেকেও।"–(পৃঃ ১৮৬)

এ উধৃতি থেকে দুটি জিনিস দেদীপ্যমান। এক–একাধিক বিবাহ প্রথা কমবেশী অসভ্য জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিলো। দুই, মানুষ যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, বহুবিবাহ প্রথা ততই তাদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে।

এতো গোলো অসভ্য কিংবা অল্পসভ্য জাতির কথা। এখন ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ভাষায় প্রচীনসভ্য জাতিগুলোর হাল–হকিকত শুনুনঃ

"বহু পত্নী কিংবা উপপত্নী প্রথা—যাকে আসল বহুপত্নী প্রথার সাথে পার্থক্য করা মুশকিল—প্রাচীন সভ্য জাতিগুলোর অধিকাংশ লোকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। চীন দেশে বৈধ বিশেষ স্ত্রী ছাড়া আরো কিছু মেয়েকে স্ত্রী বলা হতো। এদেরকে চিত্তবিনোদন উদ্দেশ্যে রাখা হতো অথবা এরা হতো সমাজসিদ্ধ রক্ষিতা। জাপানে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত চীনা ধরনের রক্ষিতা রীতি বৈধভাবেই বিদ্যমান ছিলো। অনুমিত হয়, প্রাচীন মিসরে একাধিক বিবাহের অনুমতি থাকলেও রাজা-বাদশাহদের বাইরে তার ব্যাপক প্রচলন ছিলো না।

হামুরাবীর ব্যাবিলনীয় আইনদৃষ্টে দাম্পত্য জীবন একস্ত্রীকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাথে সাথে তা এও প্রকাশ করেছে যে, কেউ বিয়ে করার পর যদি তার স্ত্রী চিররুগ্না হয়ে পড়ে, তবে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে। আর বন্ধ্যা হলে রক্ষিতা রাখতে পারবে। ইহুদী সমাজে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় বহুস্ত্রী রাখতে পারতো। এ সব স্ত্রীর মধ্যে না আইনগত কোনো পার্থক্য ছিলো আর না তাদের মধ্যে কোনো সীমা-সংখ্যা নির্ধারিত থাকতো। আরবের মুহাম্মদ (স) বলেন, একজন ব্যক্তির জন্য বৈধ স্ত্রীর সংখ্যা চারের অধিক হওয়া অনুচিত। বহু ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের মধ্যে—যেমন প্রাচীন শ্লাভ ও টিউটানিস এবং আর্য ও বৈদিক ভারতবর্ষে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। যদিও এ রীতি রাজা-বাদশাহ, দলপতি, সমাজপতি এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো..... অপরদিকে গ্রীসে একস্ত্রীই ছিলো বিবাহ বন্ধনের একমাত্র স্বীকৃত ব্যবস্থা। এথেন্সে রক্ষিতা রাখার প্রচলন ছিলো, কিন্তু তা বিবাহ প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। রক্ষিতা মেয়েরা কোনো রকম হক পেতো না। রোমান সভ্যতায় বৈবাহিক সূত্রে মাত্র একজন স্ত্রী রাখার কড়া বিধান থাকলেও বিবাহিত পুরুষ ও পতিতাদের অবাধ ঢলাঢলি সাম্রাজ্যের শেষ দিন অবধি অব্যাহত ছিলো।।-(পৃঃ ১৮৬)

ওপরের দীর্ঘ উধৃতি থেকে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একাধিক বিবাহ প্রথা একটি সাধারণ ও সার্বজনীন প্রথা হিসেবে প্রাচীন সকল সভ্যতায়ই অনর্গল চালু ছিলো। আর যে সব সভ্যতা একাধিক বিবাহকে আইনগতভাবে স্বীকার করেনি, তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো দেদার রক্ষিতা রীতি অথবা ব্যাপক পতিতাবৃত্তি। আইন রক্ষিতা বিবিদের স্বীকৃতি দিতো। সামাজিক অধিকার প্রদান করতো কিংবা অন্তত এই নিয়ম মেনে নিতো।

এছিলো প্রাচীন জাতিসমূহে প্রচলিত বহুবিবাহের কথা। এখন আধুনিক সভ্যতার কথায় আসা যাক। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা লিখেছেঃ

"বহুবিবাহ প্রথা খৃষ্টান ইউরোপেও পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সব দেশে মূর্তিপূজার যুগে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। (খৃষ্টান) শাসক সম্প্রদায় বহুবিবাহের পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি আয়ারল্যান্ডের শাসনকর্তা ডারমিটের দুই পত্নী ও দুটি রক্ষিতা ছিলো।..... শার্লিমেনেরও দুই স্ত্রী ও দুই রক্ষিতা ছিলো। তদীয় আইন সূত্রে জানা যায়, বহুবিবাহ প্রথা পাদ্রীদের মধ্যেও অপরিচিত ছিলো না। পরবর্তীকালে হাসা'র ফিলিপ এবং প্রুশিয়ার ফ্রেডারিক দ্বিতীয় উইলিয়াম লুথারপন্থী পাদ্রীদের অনুমতিক্রমে একাধিক পত্নী গ্রহণ করেন। ১৯৬০ ঈসাব্দে ওয়েস্টফিলিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরে—যখন ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের ফলে জনসংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিলো—ফ্রেঙ্কাশ রেস্টেগ জিবার্গে এক প্রস্তাব পাস করেন যে, এখন থেকে প্রতিটি লোককে দুটি করে বিয়ে করতে হবে। এ্যানাব্যাপ্টিস্ট (Anabaptists) ও মারমোন্স (Marmons) (খৃষ্টানদের দুটি গ্রুপ) অত্যধিক ধর্মীয় আবেগ নিয়ে বহুবিবাহের সুপারিশ করেছেন (এই উভয় দলই বহুবিবাহ প্রথার প্রবল সমর্থক বিধায় এ্যানাব্যাপ্টিজম ও মারমোনিজম-এর অর্থ বহুবিবাহ হয়ে দাঁড়ায়। আর মারমোনের অর্থ হয় একাধিক বিবাহকারী)।-(১৮ খন্ড, ১৮৬, ১৮৭ পৃঃ শিরোনাম-খৃষ্টধর্ম ও আধুনিক কাল (Christian and Modern Times)

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার চতুর্দশ খন্ডে 'একবিবাহ' (Monogamg) শিরোনামে লিখিত হয়েছেঃ

"একবিবাহ প্রথা—বিবাহের একক ও ব্যতিক্রমহীন রূপ হিসেবে, এই অর্থে যে, একাধিক বিবাহ কঠোর শাস্তিযাগ্য অপরাধ, পাপ এবং কলুষতা—বাস্তবে অতি রিবল ঘটনা। বিবাহ বন্ধনের এরূপ ব্যতিক্রমহীন ও অভিন্ন আদর্শ-এরূপ অটল আইনানুগ দৃষ্টিকোণ পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক তথা অত্যাধুনিক রূপ ব্যতীত কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। লেটার ডে সেন্টস (Latter Day Saints) (এটি মারমোন্স-এর দ্বিতীয় নাম)-এর বর্তমান চার্চ এবং এ্যানাব্যাপ্টিস্ট-এর খোদাদ্রোহী দলের উদ্ভট খেয়াল বাদ দিলে বহুবিবাহের প্রতি গোটা মধ্যযুগব্যাপী গীর্জার পূর্ণ সমর্থন ছিলো এবং আইনানুগভাবে তা কার্যকরও হতো। তাছাড়া, ঈসায়ী সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গীর্জা এবং রাষ্ট্র উভয়ের স্বীকৃত বিধি অনুসারে বহুবিবাহ প্রথা রাষ্ট্রের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে চালু ছিলো।"-(পৃঃ৯৫০)

এসব উধৃতি থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিস্ফুট হয়ঃ

(১) তিনশ' বছর আগ পর্যন্ত ইউরোপে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিলো এবং রাষ্ট্র তা সমর্থনকরতো।

(২) বহুবিবাহ প্রথাকে নীতিগতভাবে অবৈধ এবং আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এক বিরল ঘটনা। এটা পশ্চিমাদের আধুনিক চিন্তাধারার ফলশ্রুতি।

(৩) খৃষ্টধর্ম বহুবিবাহ প্রথার আইনগত নিষেধাজ্ঞার পক্ষপাতী নয়। ঈসায়ী সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গীর্জা তা বৈধ ও সঙ্গত জ্ঞান করতো। আর কোনো কোনো খৃষ্টান সম্প্রদায় তো বহুবিবাহ প্রথার জোর সমর্থক।

একাধিক বিবাহ প্রথা সর্বযুগ, সর্বজাতি ও সর্বদেশে চালু ছিলো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য লেটুরনিউ (Letoourneau) বিরচিত বিখ্যাত গ্রন্থ The Evolution of Marriage পঠনীয়। গ্রন্থকার তাঁর পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় বহুবিবাহ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'স্বল্পশিক্ষিত সমাজে বহুবিবাহ' প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ

"আমরা দেখতে পাই, বহুবিবাহ ব্যবস্থা স্বল্প শিক্ষিত সমাজে দুনিয়ায় সর্বত্র বিরাজমান। এতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সুসভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও শুরুতে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো এবং এই অবস্থা সর্বত্র সতত একই রূপ ছিলো। অনেক সভ্য সমাজে—মৃত হোক বা জীবিত—বিয়ে-শাদীর প্রচলন বহুবিবাহ আকারেই শুরু হয়েছে। এটা এমন এক সাধারণ ব্যাপার, যার বড় বেশী ব্যত্যয়ঘটেনি।"–(পৃঃ১৩৪)

সভ্য সমাজের একাধিক বিবাহ রীতি (Polygamy of Civilised Peoples)-এর সূচনাতেই গ্রন্থকার লিখেছেনঃ

"তাবৎ মনুষ্য সমাজই, তাদের সমাজ বিবর্তনের সূচনাপর্বে কিঞ্চিদধিক নির্মমতার সাথে বহুবিবাহ প্রথা গ্রহণ করে নিয়েছে। আমরা দেখেছি—এবং এটা এমন এক বিষয়, যেদিকে আমাদের পুনরায় ফিরে আসতে হচ্ছে—কিভাবেবহুবিবাহ প্রথার উদর থেকে একবিবাহ প্রথা বেরিয়ে এসেছে এবং ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র সভ্য সমাজে ছেয়ে গেছে।..... সত্যি কথা বলতে কি, প্রচলিত রীতিনীতি সর্বত্র একবিবাহের বাধ্যবাধকতাকে বিভিন্ন রফাদফার মাধ্যমে অনেকটা শিথিল করে দিয়েছে।"–(পৃঃ১৩৯)

এরপর গ্রন্থকার আরব, মিসর, মেক্সিকো, পেরু, ইরান ও হিন্দুস্তানে প্রচলিত একাধিক বিবাহের উল্লেখ করেন এবং দীর্ঘ আলোচনার পর এই বলে তার ইতি টানেনঃ

"ওপরে যেসব তথ্য-তত্ত্বের অবতারণা করা হলো, তার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, গোটা মানব জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা আদিকালের যৌন উচ্ছৃংখলতার স্থান দখল করে আছে। অন্যান্য সকল ব্যবস্থার মত প্রাথমিক যুগের বহুবিবাহ প্রথাও ক্রমান্বয়ে সুসংহত রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু নারী সমাজকে প্রতিনিয়ত দুর্বল পজিশনে রেখে একটি সত্য বহুবিবাহ ব্যবস্থাকে-প্রচলিত রীতিনীতি ও ধর্ম তাকে স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও ক্রমশ ধ্বংস করে দেয়। আর তা হচ্ছে বহুবিবাহ প্রথা এমন এক বিলাসী রূপ ধারণ করলো যে, কেবলমাত্র শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষেই তা করগত করা সম্ভবপর ছিলো (অর্থাৎ একাধিক বিবাহ প্রথা শাসক সম্প্রদায়ের বিলাসী রূপ ধারণ না করলে মূলত তাতে দোষের কিছু ছিলো না-নিবন্ধকার)। একই সাথে সামাজিক অনুকূল পরিস্থিতি পুরুষের মৃত্যুহার অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলো। অতপর—যেমন হার্বার্ট এস্পেন্সর বলেছেন এবং সত্যই বলেছেন—জনমত অবশ্যম্ভাবীরূপে একবিবাহের সপক্ষে চলে যায়।.....তাকে (একাধিক বিবাহ প্রথাকে) প্রত্যক্ষভাবে রাজা-বাদশাহ্, হোমরা-চোমরা ও পাদ্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়।.....সবশেষেবিধিবদ্ধ একবিবাহ প্রথা ঘোষিত হয়। কিন্তু এই একবিবাহ হচ্ছে নিছক বাহ্য ব্যাপার। কার্যত তা পারস্পরিক দফারফার মাধ্যমে শিথিল করে নেয়া হয়। এসব দফারফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তি—যা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়া হয়েছে। স্বীকার করে নেয়া হয়েছে নিরুদ্বেগে। আর রক্ষিতা ব্যবস্থাও আইনের স্বীকৃতি লাভ করেছে।" – (পৃঃ১৫২,১৫৩)

একবিবাহ ও সভ্যতা (Monogamy and Civilisation) শিরোনামে গ্রন্থকার লিখেছেনঃ

"প্রায় তাবৎ সভ্যতার মধ্যেই (মৃত হোক বা জীবিত) বিধিবদ্ধ একবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সীমিত উত্তরাধিকারীর মাঝে সম্পত্তি বন্টন। (অর্থাৎ একবিবাহ প্রথাকে বিধিবদ্ধ করার মূল কারণ নারী জাতির অধিকার সংরক্ষণ বা নৈতিক মূল্যবোধ নয়, বরং নিরেট মুনাফা লাভই হচ্ছে তার প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু।—নিবন্ধকার) সত্যি বলতে কি, অধিকাংশ আইন প্রণেতাই নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও নির্লজ্জভাবে

বহুবিবাহ প্রথাকে বৈধতার সনদ দান করেছেন। কেননা, তারা বিধিবদ্ধ একবিবাহের পাশাপাশি উপপত্নী প্রথাকেও মেনে নিয়েছেন।"–(পৃঃ ১৮৬)

বেশ্যাবৃত্তি ও অবৈধ সহবাস (Prostitution and Concubinage) শিরোনামে গ্রন্থকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেনঃ

"মধ্যযুগ এবং তৎকালীন পাদ্রীদের একপাশে রেখে আমরা আমাদের আশপাশের সুশিক্ষিত ও সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবো যে, রক্ষিতা রাখার প্রথা কার্যত নিশেষ হয়ে গেলেও তার নিকৃষ্টরূপ 'অবৈধ সহবাস' মহা ধুমধামে চলছে। প্রচলিত আইন–কানুন ও ধর্মীয় বিধি–নিষেধ শত শত বছরেও তা নির্মূল করতে পারেনি এবং অটল ও সুদৃঢ় একবিবাহ ব্যবস্থাটি আমাদের আচরিত রীতিনীতির কাছে নিশ্চিত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে আছে।" –(পৃঃ ১৬৮–১৬৯)

"....প্রচলিত রীতিনীতি আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ফলে একবিবাহ প্রথা বাস্তবের চাইতে বেশী অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। স্বল্পশিক্ষিত সমাজে নরনারীর অবৈধ মেলামেশা এবং ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচার দুষ্ট লোকদের দুষ্কর্মের পথকে আরো সুগম করে দিয়েছে। নৈতিক পবিত্রতা কি এতে হাসিল হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। উপরন্তু জারজ সন্তানে দেশ ছেয়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের জন্মদাতারা এদেরকে ফেলে রেখে যায় এবং জন্ম থেকেই এরা অন্তহীন দুঃখ–দুর্দশার সম্মুখীন হয়। ফলে, হাজারো সংকট–সমস্যার উদ্ভব ঘটে। যার সমাধান একদিন না একদিন আইনকে করতেই হবে। বিধিবদ্ধ রক্ষিতা ব্যবস্থা চীনকে (এটা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র) এ সব সমস্যা থেকে রক্ষা করেছে। নিসন্দেহে আদর্শ বস্তু অনেক উত্তম। কিন্তু তার জন্য সত্যকে বিসর্জন দেয়া এবং মানব প্রকৃতির দাবী উপেক্ষা করে আইন রচনা করা বোকামি।"–(পৃঃ১৬৯–১৭০)

গ্রন্থকার অন্য এক স্থানে লিখেছেনঃ

"আমরা কেবল চোখ খুললেই অনুভব করতে পারবো যে, বর্তমান যুগেও আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারী ডাকসাইটে দেশগুলোর অধিকাংশ উচ্চ শ্রেণীর লোক বহুবিবাহের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে থাকেন। যা প্রতিরোধ করতে ঐসব দেশ হিমশিম খাচ্ছে। " –(পৃঃ১৩৬)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত ফলাফল বেরিয়ে আসেঃ

(১) স্বল্পশিক্ষিত সমাজে বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিলো।

(২) সকল সভ্য সমাজে সভ্যতার প্রথম পাদে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিলো। ধর্ম, দেশাচার ও আইন-কানুন তাকে বৈধ ও সিদ্ধ বলে স্বীকার করেছে।

(৩) পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে (নৈতিক কারণে নয়) জনমত বহুবিবাহের বিপক্ষে চলে যায়। এতদসত্ত্বেও রাজা-বাদশাহ, ধর্মযাজক ও সমাজপতিদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিলো এবং তাকে বৈধ ও আইনানুগ বলে স্বীকার করা হয়।

(৪) সবশেষে এমন এক সময় এলো, যখন ইউরোপে বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো এবং একবিবাহ প্রথা বিধিবদ্ধ রূপ পেলো।

(৫) এই একবিবাহ প্রথা ছিলো নিছক বাহ্যাবরণ। কার্যত পাশ্চাত্য দেশের সমাজরীতি এই আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যিনা, ব্যভিচার, অবাধ মেলামেশা এবং মুক্তকচ্ছ রক্ষিতাবৃত্তি একবিবাহ প্রথাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে। অবশেষে আইনকে দেশাচারের কাছে পরাভব মানতে হলো। অবৈধ সহবাস ও অবাধ যৌনাচারকে সাধারণ লাইসেন্স দেয়া হলো। রক্ষিতা রাখার ব্যাপক প্রচলন অধিকাংশ দেশে আইনগত মর্যাদা পেলো

(৬) এই পরিস্থিতি সমাজের স্বচ্ছ-শালীনতা ও পূত-পবিত্রতা হরণ করে। সমাজকে অসহায় ও অবৈধ সন্তানের মস্ত বাহিনী উপহার দেয়। যা সমাজের মাথা ব্যথার কারণ হয় এবং এ থেকে অসংখ্য জটিল সমস্যার জন্ম নেয়।

(৭) একাধিক বিবাহ প্রবণতা আজো বিদ্যমান। বিদ্যমান সুশিক্ষিত ও সুসভ্য সমাজের মধ্যে। এ প্রবণতা সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই সক্রিয়। এতই সক্রিয় যে, তা রোধ করা কঠিন। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই স্বচক্ষে তার নিদর্শন দেখতেপারেন।

(৮) একবিবাহের আইন যদিও একটি আদর্শ আইন, কিন্তু তা মানবীয় চাহিদার অনুকারী নয়। বাস্তব সত্যকে আদর্শের যূপকাষ্ঠে বলি দেয়া এবং মানব-প্রকৃতির দাবী উপেক্ষা করে আইন রচনা করা নিছক বোকামি।

(৯) এখন আমাদের ভুল উপলব্ধি করার সময় এসেছে। একবিবাহ প্রথা আইনত সিদ্ধ করার সময় উপস্থিত। আর এ কারণেই ডঃ রোম ল্যান্ডো (Rom Landau) বলেছেনঃ

"ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, বহুবিবাহ প্রথা মুক্তমনে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।" -(Sex, life and Faith)

শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) তাঁর এক নিবন্ধ Veber die weife -এ প্রশ্ন রেখেছেন—

প্রকৃত একবিবাহ কোথায় পাওয়া যায়, অনুরূপ, জেম্‌স্ হিনটন (James Hinton) প্রশ্ন করতেন—এক স্ত্রী গ্রহণ করার অর্থ কি? এ আইন পালন করা কি সম্ভব? আপনি কি ইংরেজদের জীবনধারা একস্ত্রী বিশিষ্ট বলতে পারেন? (Studies in the Psychology of sex, Vol.II, Part III, P. 492, by Havelock Ellis)

পরিশেষে আমরা প্রখ্যাত যৌন মনস্তাত্ত্বিক ও গ্রন্থকার হ্যাভলক এলিসের (Havelock Ellis) বিখ্যাত পুস্তক 'যৌন মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন' Studies in the Psychology of sex) -এর একটি উধৃতি পেশ করছি। উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হলেও এতে পাঠকদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার খোরাক রয়েছে।

"একথা অনিবার্যভাবেই বলা যায় যে, দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক রূপ একস্ত্রী প্রথা যৌন-বৈচিত্রের বিরোধী নয়—বরং প্রকৃতপক্ষে তার সমর্থক ও সহায়ক।— সর্বব্যাপী যৌন বৈচিত্র হলো—যার জীবন্ত ভিত্তিও সুস্পষ্ট বিদ্যমান-বহু বিবাহ প্রবণতা। এ প্রবণতা সভ্যতার সকল স্তরে দৃশ্যমান। এমনকি সর্বোচ্চ সভ্যতায়ও অসমর্থিত ও ন্যূন্যাধিক স্বাধীন যৌনাচার রূপে এই প্রবণতা বিদ্যমান। একথা অবশ্যই স্মর্তব্য যে, যেখানে বহুবিবাহ প্রথা আইনসম্মত করা হয়েছে, সেখানেও তার প্রচলন সর্বব্যাপী নয়। এ হচ্ছে নামকা ওয়াস্তে এক ছাড়পত্র বিশেষ। দুনিয়ায় নারীর সংখ্যা কখনো এত অধিক হয় না যে, কতিপয় ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ লোকেরাও একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে। .....বহুস্ত্রী প্রথা (Polygamy) এবং বহুস্বামী প্রথার (Polyandry) যেসব চেহারা আজকাল আমরা দেখতে পাই, তার সবগুলোই হচ্ছে বহুবিবাহ প্রথার কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক রূপ। বিবাহ বন্ধন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভিত্তির ওপর ভেঙ্গে যেতে পারে, আইনের দৃষ্টিতে ভাঙতে পারে না। ফলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার জীবন সঙ্গিনীকে পরিবর্তন করে এবং এভাবে নৈসর্গিক একস্ত্রী প্রথাকে বজায় রাখার স্থলে অতিরিক্ত আরেকটি সঙ্গিনী জুটিয়ে নেয়। আর এভাবেই অনৈসর্গিক বহুবিবাহ প্রথা সমাজে চালু হয়। একবিবাহ ব্যবস্থার দরুন প্রতিনিয়ত এই ধরনের যৌন-বৈচিত্রের উদ্ভব ঘটতে থাকবে। কোনো

সভ্যতাই যৌন-বৈচিত্রের দুশমন নয়। এ যৌন-বৈচিত্রকে আমরা বৈধ ভাবী আর অবৈধ, এটা যে ঘটবেই, তা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত। সামাজিক বিচক্ষণতার পথ হচ্ছে একদিকে বিয়ে—শাদীর ব্যাপারটিকে যথাসম্ভব শিথিল করে ফেলা—যাতে করে এর অপকারিতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। আর অপরদিকে এই অপকর্ম যদি সংঘটিত হয়েই যায়, তবে তাকে সংগত জ্ঞান করার এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে—যা তার অনিষ্টকারিতাকে প্রতিরোধ করতে পারে এবং সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতিও সুবিচার করা হয়। .....বিশ্বের কোথাও এতটা বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত নেই, যতটা আছে খৃষ্টান জগতে। আর বিশ্বের কোথাও বহুবিবাহজনিত দায়িত্ব এড়ানো পুরুষের পক্ষে এতো সহজ নয়, যতটা সম্ভব এসব দেশে।"-(দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ৪৯১-৪৯৩)

এ উধৃতি থেকে নিম্নোক্ত রিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ

(১) একবিবাহ প্রথা অনিবার্যভাবে একাধিক বিবাহ প্রথা জন্ম দেয়।

(২) খৃষ্টান জগতে—যেখানে একবিবাহ প্রথা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে—একাধিক বিবাহ প্রথা দুনিয়ার তাবৎ দেশ থেকে অধিক প্রচলিত। এটা ভিন্ন কথা যে, তা প্রচলিত আছে অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম আকারে এবং প্রথা হিসেবে তার কোনো আইনসম্মত স্বীকৃতি নেই।

(৩) একাধিক বিবাহ প্রথা বিধিবদ্ধ না করার কারণ হচ্ছে, নারী সমাজের ওপর অবিচার না করা। পুরুষরা তাদের ভোগ করবে, কিন্তু কোনো দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে না-এটা প্রকাশ্য যুলুম। খৃষ্টান জগতে এই যুলুম প্রকাশ্যভাবেই চল্‌ছে।

একাধিক বিবাহ প্রথা

সামাজিক ও নৈতিক জটমোচন

পূর্বোক্ত আলোচনায় পাশ্চাত্য চিন্তানায়ক ও ইউরোপের যৌন-বিজ্ঞানী ও যৌন-মনস্তত্ত্ববিদদের যেসব অভিমত তুলে ধরা হলো, তাতে এ সত্যটিই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, একাধিক বিবাহ প্রবণতা মানব জাতির একটি নৈসর্গিক প্রবণতা ভিন্ন আর কিছু নয়। এতই নৈসর্গিক যে, সকল কাল, সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যেই তা বিদ্যমান ছিলো। একাধিক বিবাহের আইনগত নিষেধাজ্ঞাও এই ঝোঁক-প্রবণতা রোধ করতে পারেনি। বরং তাতে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। একথাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, সামাজিক ও নৈতিক হিত-কল্যাণ একাধিক বিবাহ প্রথায়ই বিদ্যমান। অতএব, বুদ্ধিমত্তার কাজ হলো, কিছু শর্ত-নিয়ম আরোপ করে একাধিক বিবাহ প্রথাকেই আইনত স্বীকার করে নেয়া এবং সমাজকে বহুপত্নিতার অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, বেআইনী ও চরিত্রবিধ্বংসী পথ থেকে মুক্তি দেয়া। শেষোক্ত কথাটি পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছিলো। এক্ষণে বিষয়টির বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

নারীর সংখ্যাধিক্য

প্রাকৃতিক নিয়মেই নারী ও পুরুষ প্রায় সমসংখ্যক জন্ম নেয়। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন অনেক সময় পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে নারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। নারীর সংখ্যাধিক্য তখন জাতির জন্য এক উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।। একদিকে তাদের খাওয়া-পরা ও আবাসিক সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে, আর অন্যদিকে তাদের যৌন চাহিদার নৈতিক নিবৃত্তি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সাথে সাথে এ দুশ্চিন্তাও মাথা তুলে দাঁড়ায় যে, যুব সমাজের আমল-আখলাক তথা গোটা সমাজের নৈতিক চরিত্র কিভাবে রক্ষা করা যাবে। কেননা, সমাজে যখন অনৈতিকতা জন্ম নেয়, তখন তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পর্যায়েই সীমিত থাকে না, যথাসময়ে তার মূলোচ্ছেদ না হলে মহামারী আকার ধারণ করে এবং এক সময় তা গোটা সমাজ-সমষ্টিকেই গ্রাস করে ফেলে। শুধু তাই নয়, অবৈধ শিশু-সমাহার, অসংখ্য নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সাথে করে নিয়ে আসে। এভাবে গোটা সমাজ জীবন নৈতিক উচ্ছৃংখলা, সামাজিক বিশৃংখলা ও দুর্বহ সংকটের শিকার হয়ে পড়ে। এই সমস্ত পুঞ্জীভূত সমস্যা-সংকট ও বিপদাপদের জটমোচনের একমাত্র

বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থা হলো কতিপয় শর্তাধীনে পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দান। এ ছাড়া এ জটিল সমস্যার ভিন্ন কোনো সমাধান নেই।

নারীর সংখ্যাধিক্য অবস্থায় একজন পুরুষের একাধিক নারী-সংসর্গ লাভ অপরিহার্য। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রশ্ন শুধু এই যে, এই সংসর্গ কি নৈতিক ও বিধিসম্মত হবে? আর তার বিনিময়ে নারী পাবে একটি আবাসগৃহ, খাওয়া-পরা ও পুরুষের দায়-দায়িত্ব। তার সন্তানরা পাবে আইনগতভাবে সামাজিক স্বীকতি। তারা পিতার স্নেহ-মমতার ছায়ায় লালিত-পালিত হবে। পরিবারের উত্তরাধিকার লাভ করবে। অথবা এই সংসর্গ হবে সম্পূর্ণ বেআইনী ও অনৈতিকতাসুলভ? যার পর স্ত্রী ও তার সন্তানদের উপরোল্লিখিত কোনো সুবিধাই লাভ হবে না। দ্বারে দ্বারে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা কুড়িয়ে ফেরবে। আর সমাজকে করবে দূষিত ও কলুষিত। ইসলাম প্রথমোক্ত পথটি গ্রহণ করেছে এবং এই জটিল সমস্যার সমাধানে এ পথ অবলম্বনেরই জোর সুপারিশ করেছে। আর দ্বিতীয় পথটিকে আইনগতভাবে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং নীতিগতভাবে মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছে। পক্ষান্তরে বিধিবদ্ধ এক বিবাহের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমর্থকগণ একাধিক বিবাহের প্রথমোক্ত পথকে নীতিগতভাবে গর্হিত এবং আইনগতভাবে নিষিদ্ধ মনে করেন। আর দ্বিতীয় পথটিকে ইংরেজরা শুধু গ্রহণই করেনি, অনেক সময় তারা একে সভ্যতার নিদর্শনও মনে করে থাকেন। যদিও ইদানীং শীর্ষস্থানীয় পশ্চিমা চিন্তানায়কগণ এই 'সভ্য নীতি'র প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন এবং একাধিক বিবাহ প্রথার প্রতি তাদের আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার অষ্টাদশ খন্ডে বহুবিবাহের কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছেঃ

"একাধিক বিবাহের অন্যতম কারণ হচ্ছে বিবাহযোগ্য নারীর সংখ্যাধিক্য। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, যখন উপজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর সংখ্যা অধিক হবে, তখন সেখানেও অনিবার্যভাবে বহু বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হবে।" -(Polygamy, P.187)

নারীর সংখ্যাধিক্য কোনো বিরল ঘটনা নয়। কোনো অসভ্য ও বন্য জাতির মধ্যেও সীমিত নয়। প্রতিটি সভ্যজাতিই স্ব স্ব আমলে এ সমস্যার শিকার হয়েছে। এখন ইউরোপও এর শিকার। যুদ্ধ ও রক্তের সাগর পেরিয়েই কোনো জাতি ক্ষমতার উচ্চমার্গে আরোহণ করতে পারে। আর যুদ্ধ হচ্ছে এমন এক অভিশাপ—যা পুরুষকে

গলাধকরণ ও নারীকে অসহায় করে পথে বসায়। সুবিখ্যাত যৌন বিজ্ঞানী ও বিবাহ বিষয়ক মূল অথরিটি বলে স্বীকৃত ডঃ ওয়েস্টার মার্ক (Dr. Wester Marck) বলেনঃ

"আমরা যদি বিবাহের বয়স বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ধরি, তাহলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে (সংখ্যাগত) পার্থক্য সাধারণত শতকরা তিন/চার ভাগ নারীকে একাকিনী জীবন যাপন করতে বাধ্য করবে। আর এ হচ্ছে নির্ঘাৎ একবিবাহের পরিণতি।" (The Future of marreage in western civilisation).

এ হচ্ছে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশের জনসংখ্যা জরীপের ফলাফল। কিন্তু যুদ্ধের পর পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। বৃটিশ সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে অবস্থার কতকটা চিত্র আঁচ করা যেতে পারেঃ

"ত্রিশ লক্ষের অধিক নারী স্বামী, সন্তান এমনকি ঘর-সংসারের আশা ত্যাগ করে একাকিনী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। নারীর সংখ্যাধিক্য বিগত শতাব্দীতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৩৯ ঈসাব্দে বৃটেনে পুরুষের চেয়ে ২৮১৮৩৪৩ (আটাইশ লক্ষ আঠার হাজার তিনশত তিতাল্লিশ) জন নারী বেশী ছিলো। এবারের যুদ্ধ আরো তিন লক্ষ পুরুষ ছিনিয়ে নিয়েছে। হাজার হাজার পুরুষ পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়েছে। এরা রোগশয্যা ত্যাগ করতে অপারগ। ঐ হাজার হাজার যুবতীর উপায় কি হবে, যাদের স্বামী ও উপার্জনকারী শেষ হয়ে গেছে? বস্তুত এ হচ্ছে যুদ্ধোত্তর বৃটেনের এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা"-(এ বর্ণনা সানডে ক্রনিক্যাল (Sunday Chronicle)-এর এক মহিলা কলামিস্টের)।

লাহোরের একটি দৈনিক পত্রিকার লন্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখেছেনঃ

"দুটি বিশ্বযুদ্ধ ইংল্যান্ডে নারী ও পুরুষের সংখ্যাসাম্য তছনছ করে দিয়েছে। এখন নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে বেশী। আর এ সব নারীর অধিকাংশই বিয়ের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রেখে বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছে। তারা জীবনকে ভোগ করার যাবতীয় উপকরণ সামনে পাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে।"

"অধিকাংশ যুবতী মেয়ের জীবনে একটি মাত্র লক্ষ্যই স্থির হয়ে আছে, আর তা হচ্ছে, একটি স্বামী যোগাড় করা। এই স্বামী-অন্বেষণে সে কোনো সুযোগকেই হাতছাড়া করছে না। প্রতিটি ছেলেবন্ধুকেই সে তার হবু স্বামী করার কল্পনা মনে মনে লালন করছে।"

"প্রকৃতপক্ষে পুরুষের সংখ্যাল্পতা শুধু ইংল্যান্ডে নয়—গোটা ইউরোপেই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৈতিক উচ্ছৃংখলতা ও অনৈতিকতার ভয়ানক আধিপত্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে, পুরুষের সংখ্যাল্পতা। নারীর বিবাহেচ্ছা তার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তাবীদদের মতবাদ হচ্ছে পুরুষের একাধিক বিবাহ না করা। অবশ্য অবৈধ নারী সংসর্গে বাধা নেই। পশ্চিমা আইন–কানুন ও ধর্ম মতে, বিবাহহীন অবৈধ নারী সংসর্গ ও রক্ষিতা রাখায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু একাধিক বৈধ বিবাহ অমার্জনীয় অপরাধ। একে তারা নীচতা, হীনতা ও অভদ্রতা মনে করে।"

"পুরুষের সংখ্যাল্পতা শুধু বৃটেনেই নয়–আমেরিকায় এক কোটি বিশ লক্ষ অবিবাহিতা কুমারী এবং মাত্র নব্বই লক্ষ অবিবাহিত কুমার আছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই পুরুষের সংখ্যা কম।"

ডাঃ মেকফেরলিন তাঁর গ্রন্থ The case for Polygamy-তে কথাটা একটু অন্যভাবেবলেছেনঃ

"বহুবিবাহ প্রথা চালু আছে—এতেই প্রমাণ হয়ে যে, উভয় শ্রেণী সমানুপাতে নেই। আমি এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি অতীতে বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকায় বিরাটাকারে নারীদের সংখ্যাল্পতা দেখা দিয়েছিলো কিনা। পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের সংখ্যা যদি সমানও হয়, তবু খোদ যুক্তির দিক থেকে একবিবাহ প্রথার দাবী হচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করা। অন্য কোনো যুক্তি ব্যতিরেকে এই একটি মাত্র যুক্তিই প্রমাণ করে যে, একবিবাহ প্রথা কোনো সার্বজনীন ও সাধারণ ব্যবস্থা হতে পারে না।" (বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রোগজনিত কারণে কতক লোক বিবাহ করতে পারে না, ফলে কতক নারী অবিবাহিতা থেকে যায়। এদের সদ্‌গতি একবিবাহ প্রথায় নয়—একাধিক বিবাহ প্রথায়ই সম্ভব। – নিবন্ধকার।)

নারীর সংখ্যাধিক্যের দরুন একজন দুইজন নয়—বহু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদই একাধিক বিবাহ প্রথা সমর্থন করেছেন। স্যার জর্জ স্কট (Sir Georege scot) বলেছেনঃ

"নারীদের সংখ্যাধিক্য দেখে আমাদের এই শতাব্দীতে যারা বহুবিবাহ প্রথা সমর্থন করছেন, তাদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।" (Encyclopaedia of modern Knowledge, Vol. V. p. 2572)

নারীর চিররুগ্নতা ও বন্ধ্যা হওয়া

স্ত্রী যদি চিররুগ্না ও ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসে অক্ষম হয়, কিংবা যৌন সংসর্গ তার জীবন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তখন স্বামী বেচারাকে আপনি কি পরামর্শ দিবেন? আপনি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলবেন? কিন্তু ধৈর্যেরও তো একটা সীমা-পরিসীমা আছে। তাছাড়া, যৌন ব্যাপারে বেশী দিন ধৈর্য ধারণ করা, আর তাও কিছুদিন যৌন স্বাদ-আস্বাদ ভোগ করার পর সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তবে কি করা উচিপ? স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিবে? তাহলে তো স্ত্রীকে নিরুপায় ও অসহায়তার মধ্যে ঠেলে দেয়া হলো। এমন নারীর তো অন্যত্র বিয়ে-শাদীও হবে না। তবে কি স্বামী অন্য মেয়েদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াবে? অথবা কামপ্রবৃত্তি নিবারণে কোনো অপ্রাকৃত পন্থার আশ্রয় নিবে? তাহলে তো খোদ্ নিজেকে, নিজ সমাজের নারীদেরকে এবং নিশেষে গোটা সমাজকেই কলুষিত করা হলো।

সত্যি কথা বলতে কি, এমতাবস্থায় এছাড়া আর কোনো পথ নেই যে, স্বামী আরেকটি বিয়ে করবে এবং উভয় স্ত্রীর সাথে সুবিচার করবে। কেবল এভাবেই নৈতিক সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বামীর কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হতে পারে। ঘরের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। প্রথম স্ত্রী ও তার সন্তানাদি বিপদমুক্ত হতে পারে। তার সমাজ-সমষ্টিও অনৈতিকতার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। আপনি যতই ভাবুন না কেনো, এই একটি মাত্র সমাধান ছাড়া আর কোনো পথই আপনি খুঁজেপাবেননা।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি জিনিস হচ্ছে নারীর বন্ধ্যাত্ব। স্বামীর সন্তান কামনা যুক্তি ও প্রকৃতি উভয়েরই দাবী। অনেক সময় এ জিনিসটি কামনার চাইতেও বেশী জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। পিতা তার অসমাপ্ত কাজ নিষ্পন্নকরণ, বংশ পারম্পর্য ও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সন্তানের মুখাপেক্ষী হয়। এ প্রয়োজন কি করে মিটবে? দীর্ঘ দিনের জীবনসঙ্গিনীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী বরণ করে? কিন্তু তালাক তো সর্বশেষ হাতিয়ার। স্ত্রীর দোষ কি, তাকে তালাক দেয়া হবে? বন্ধ্যাত্ব তো প্রাকৃতিক বিচ্যুতি, তাতে স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দখল নেই। তাছাড়া তালাকী স্ত্রীর বিয়ে হওয়াও দুষ্কর। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তিই সন্তান কামনা করে। আর এও তো হতে পারে, বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর হওয়ায় তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অনিচ্ছুক। এরপর শুধু একটি পথই খোলা থাকে. আর তা হচ্ছে,

স্বামী আরেকটি বিয়ে করবে এবং ইনসাফের সাথে উভয় স্ত্রীর হক আদায় করবে। এ পথ তালাকের পথ থেকে নিশ্চয়ই উত্তম। নির্বোধ লোকই কেবল এর নিন্দা করতে পারে। কিংবা তালাককে এর ওপর প্রাধান্য দিতে পারে। আপনিও বলতে পারেন, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ না করে সন্তানের জন্য ধৈর্য ধারণ করবে। নিসন্দেহে স্বামী সে পথ অবলম্বন করতে পারে। অনেক লোক তা করেও বটে। কিন্তু স্বামী যদি সন্তানের আকাংখী কিংবা মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে আপনি তাকে তার এই স্বভাবসম্মত দাবী ও প্রকৃত প্রয়োজন পূরণে বাধ সাধতে পারেন না। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার অষ্টাদশ খন্ডে বহুবিবাহের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ

"পুরুষের সন্তান কামনা প্রাচ্যে বহুবিবাহের এক বিশিষ্ট কারণ"–(পৃঃ ১৮৭)

বদ মেজাজ স্ত্রী

কোনো কোনো স্ত্রীলোক বড় বদমেযাজী হয়ে থাকে। (এর অর্থ এই নয় যে, পুরুষ লোক বদমেজাজ হয় না কিংবা পুরুষের বদমেযাজীর দরুন স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হয় না। উগ্রতা ও বদমেযাজী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই আছে। খারাপ সম্পর্কের কারণ কখনো স্বামী, কখনো স্ত্রী আবার কখনো উভয়েই হতে পারে। এখানে শুধু দ্বিতীয় কারণটি আলোচিত হচ্ছে।) স্বামী তার প্রয়োজন যতই পূরণ করুক না কেনো, যতই প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করুক না কেনো, তার মনের নাগাল সে পায় না। স্ত্রীর এই রূঢ়তার দরুন ঘরের শান্তি–শৃংখলা বিনষ্ট হয়। সন্তানের শিক্ষা–দীক্ষা বিঘ্নিত হয়। স্বামীর মানসিক শান্তি ক্ষুণ্ন হয়। যৌনকর্ম ছাড়া দাম্পত্য জীবনের কোনো স্বাদই সে পায় না। এমনও শোনা যায়, স্ত্রী যৌনকর্মের জন্যও সম্মত হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, স্বামী এমতাবস্থায় কি করবে?

আদর্শ পন্থা হচ্ছে স্বামীর ধৈর্য ধারণ করা এবং প্রীতি ও সহানুভূতির সাথে স্ত্রীর সংশোধনে ব্রতী হওয়া, কিন্তু এ হচ্ছে থিউরিটিক্যাল কথা। আদর্শবাদের কথা। সাধারণ নির্দেশ এ হতে পারে না। সাধারণ মানুষ থেকে এটা আশাও করা যায় না। তাছাড়া, কখনো কখনো পানি নাকের ওপরে উঠে যায়। তখন আদর্শ পালন করার অবকাশ থাকে না। অতপর দুটি পথই কেবল অবশিষ্ট থাকে। একটি তালাক, অপরটি দ্বিতীয় বিবাহ। আর দ্বিতীয়টি যে প্রথমটির চেয়ে ভালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যোগ্য পাত্রের অভাব

প্রত্যেক মা-বাবাই চান তার মেয়ের জন্য একটি যোগ্য পাত্র। তাদের এই আকাংখা প্রকৃতিগত যেমন, তেমনি যুক্তিসম্মত। মেয়ের ভবিষ্যতের জন্যও তা মঙ্গলজনক। কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তির পরিচিত পরিমন্ডলে অবিবাহিত যোগ্য পাত্র মেলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। (এ কোনো কাল্পনিক চিত্র নয়। পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশেই শুধু নয়, প্রায় সব দেশেই যুব শ্রেনীর ক্রমবর্ধমান উদ্বেগজনক নৈতিক অবনতি এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং কনের মা-বাবাদের জন্য এটা এক দুঃসহ মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে।) অবশ্য বিবাহিতদের মধ্যে কখনো সৎ ও নির্ভরযোগ্য পাত্র পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় মা-বাবার সামনে দুটি পথ এসে দাঁড়ায়। এক, যেকোনে এক অযোগ্য ও অসচ্চরিত্র অবিবাহিতের কাছে সমর্পণ করে কনের জীবনটি চিরতরে বিনষ্ট করে দেয়া এবং খোদ্ মা-বাবার জীবনকেও বিষাক্ত করে তোলা। দুই, এমন এক ব্যক্তিকে যোগাড় করা, সে যদিও বিবাহিত, কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও চরিত্রবান। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই দ্বিতীয় পথটিকে উত্তম মনে করবে এবং এরূপ একটি পাত্র পাওয়া মাত্র কনেকে নির্দ্বিধায় তার হাতে তুলে দিবে।

এতীম ও বিধবা বিবাহ

এতীম ও বিধবা সমাজের একটি বোঝা। কোনো কোনো জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ অবৈধ ও অকল্পনীয়। (হিন্দুস্তানে সতীদাহ প্রথার প্রধান কারণ ছিলো হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকা। হিন্দু ধর্ম সংস্কার পন্থীরা এই কুসংস্কার দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সফল হতে পারেননি।) কোনো কোনো জাতি-ধর্মে তালাকী নারী-বিবাহেরও অনুরূপ অবস্থা।

কোনে কোনো সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও তা লজ্জা ও গ্লানির বিষয়। যেসব সমাজে বিধবা ও মুতাল্লাকা (তালাকী নারী) বিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানেও বিধবা ও মুতাল্লাকা নারীকে কুমারী মেয়ের চেয়ে হীন জ্ঞান করা হয়। তাদের বিবাহ-শাদী দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি বিধবা ও মুতাল্লাকার সাথে ছেলেমেয়ে থাকে, তাহলে তো বিয়ে ব্যাপারটি আরো কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে এবং সেই অনুপাতে বিধবা ও মুতাল্লাকা নারীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা, তার ওপর কেবল তার নিজেরই বোঝা নয়, তার বাল-বাচ্চার বোঝাও চেপে বসে। একই অবস্থা অসহায় এতীম বালিকাদেরও। তাদের বিয়ে-শাদী হয়ত আদৌ হয়ই

না, আর হলেও সাধারণত দুশ্চরিত্র বা অথর্ব লোকই তাদের ভাগ্যে জোটে। অনেক সময় নিঃস্ব মাতা-পিতা ও অভিভাবকরা দরিদ্র ও নির্বাক মেয়েকে নিয়ে সওদাবাজি করে। এবং যে ব্যক্তি বেশী টাকা পয়সা দিতে পারে, মেয়েকে তারই হাতে তুলে দেয়। চাই সে বৃদ্ধ কিংবা দুশ্চরিত্র, যালিম বা চোর-ডাকাতই হোক না কেন। আর মেয়েটি জীবনভর ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অমুসলিম জাতি কর্তৃক প্রভাবান্বিত হওয়ার দরুন উপমহাদেশের মুসলিম সমাজেও এই অবস্থা সবিশেষ বর্তমান। ফলে, এ অঞ্চলেও অনেক সামাজিক নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। স্ত্রীলোক অবিবাহিত থাকলে শুধু নৈতিক বিপর্যয়ই সূচিত হয় না, বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটও মাথা চাড়া দেয়। স্ত্রী ও তার বাচ্চা-কাচ্চা কোথায় থাকবে। কি খাবে। তাদের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান কে করবে। গার্জিয়ান ও অভিভাবক কে হবে। এসব প্রশ্ন নির্জলা বাস্তব। এর একটি মাত্র জবাবই হতে পারে, আর তা হচ্ছে—বিবাহ। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে—বিধবা, পরিত্যক্তা ও এতীম বালিকাদের বিবাহ খুবই মুশকিল ব্যাপার। সচ্ছল অবিবাহিত লোকে সাধারণত সচ্ছল কুমারী মেয়েকেই পছন্দ করে থাকে। ফলে, নিসম্বল ও অকর্মণ্য লোকই এসব কৃপার পাত্রী এতীম বিধবার কপালে জোটে। আর এতে করে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে

একথা সত্য যে, বিধবা ও পরিত্যক্তা নারীর কুমারী বালিকার মর্যাদা লাভ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এটা মানবীয় মনস্তত্ত্বেরও পরিপন্থী। সুতরাং অবিবাহিত ও সক্ষম ব্যক্তি যদি বিধবা, পরিত্যক্তা ও অসহায় এতীম বালিকার প্রতি বেশী আকর্ষণ বোধ না করে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। এমতাবস্থায় এ সমস্যার মাত্র দুটিই সমাধান হতে পারে। এক—কোনো দীন-হীন অক্ষম পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া। দুই—কোনো আল্লাহভীরু বিবাহিত পুরুষকে আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বিতীয় বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করা। যদি সে রাযী হয়, তবে তার সাথে উপরোক্ত পাত্রীর বিবাহ দেয়া। আমার জানা নেই, এ সমস্যার এই দুই সমাধান ছাড়া তৃতীয় কোনো উত্তম সমাধান হতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোনো বিধবা, পরিত্যক্তা কিংবা এতীম ও গরীব মেয়েকে বিবাহ করবে, সে মহা প্রতিদান লাভ করবে। আর অভিহিত হবে মানবতার পরম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। বলা বাহুল্য, এই সমাধান বিবাহ না হওয়া কিংবা অপাত্রে হওয়া অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়।

নারীর স্বাভাবিক অক্ষমতা

দাম্পত্য জীবনের মৌল বিষয় যৌন ক্ষুন্নিবৃত্তি। এটা মানুষের স্বাভাবিক দাবীও। নৈতিক সদাচার সংরক্ষণেও এর মৌলিক গুরুত্ব সুস্থিত। একজন পুরুষের পক্ষে তার যৌন দায়িত্ব পালন করা সর্বদা সম্ভব। কিন্তু নারী সব সময় এ কাজের উপযোগী নয়। প্রতি মাসে তিন দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত তার ঋতুস্রাব ঘটে। এ সময় সে রতিক্রিয়া সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে। সন্তান প্রসবের পরও প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে এই অবস্থায় পতিত হয়। গর্ভাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখা মা ও সন্তান উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। অনেক সময় গর্ভপাতও ঘটে থাকে। ফলে,সন্তান নষ্ট হওয়া ছাড়া প্রসূতির জীবনহানিরও আশংকা দেখা দেয়। দুগ্ধপানকালে স্ত্রী-সহবাস শিশুর স্বাস্থোপযোগী হয় না। এ সময় স্ত্রী গর্ভধারণ করলে স্তনের দুধ কম বা খারাপ হয়ে যেতে পারে। গর্ভ ও দুগ্ধদানকাল কয়েক বছর অবধি চলতে থাকে। সুস্থ ও সবল পুরুষের পক্ষে এতদিন ধৈর্য ধারণ করা খুবই কষ্টকর। বিশেষত এযুগে যখন অশ্লীল গান, বাজনা, কদর্য নভেল-নাটক, কামোদ্দীপক সিনেমা-থিয়েটার এবং উলঙ্গ ও নির্বাক সৌন্দর্য চর্চার প্রদর্শনী মানুষের কামলিপ্সাকে উত্তপ্ত করে রেখেছে। এরূপ ব্যক্তির যদি সহায়-সম্বল থাকে, তাহলে দুটি পথের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। এক—কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া। নিজের ঘরে রক্ষিতা রাখা। পরকীয়া প্রেমে নিয়োজিত হওয়া কিংবা কোনো বিকৃত ও অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করা। দুই—আরেকটি বিবাহ করা এবং নৈতিক সীমার মধ্যে থেকে যৌন ক্ষুন্নিবৃত্তির সাথে সাথে স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততিদেরও হক আদায় করা। নীতিবান ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই প্রথম পথকে ভ্রান্ত ও সমাজ বিধ্বংসী এবং দ্বিতীয় পথকে সঠিক ও শ্রেয়তর গণ্য করবেন। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার অষ্টাদশ খন্ডে বহুবিবাহের কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

"অনেক সরলপ্রাণ স্বামী (এতে সরলতার কি আছে? এতো স্বাস্থ্যবিধিরই কথা!-নিবন্ধকার) প্রতিমাসে কেবল একটি বিশেষ সময়কালই আলাদা থাকে না, বরং স্ত্রীর গর্ভাবস্থা বা ন্যূনপক্ষে গর্ভের শেষের দিকে এবং সন্তান প্রসবের পর শিশুর দুধ না ছাড়া পর্যন্ত স্ত্রী থেকে দূরে থাকে। যার মর্মার্থ হচ্ছে, স্ত্রী থেকে স্বামীর বিচ্ছিন্নতা দুই কিংবা ততোধিক বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।" (পৃঃ ১৮৭, শব্দ-পোলাগেমী)

এন্থনী এম, লুডোভিসি (Anthony M. Ludovici) বলেছেনঃ

"একবিবাহপ্রথায়—যা দুটি বিবাহযোগ্য সুস্থ-সবল নর-নারীর মধ্যে সংগঠিত হয়, —স্বামী নিজকে এক অলংঘনীয় সংকটে নিপতিত পায়। যদি সে স্বাস্থ্যবান ও সুস্থ-সবল হয়, তাহলে স্ত্রী থেকে কয়েক মাস বিচ্ছিন্ন থাকার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। অথচ সন্তানের মঙ্গলের জন্যই তার এরূপ বিচ্ছিন্ন থাকা অপরিহার্য। —আধুনিক সভ্যতার বসনাঞ্চল এই কদর্যতায় মসিমলিন যে, তার গৃহীত কর্মনীতির ফলে একজন স্বামী এই সময়ে অভিসার, প্রতারণা, কৃত্রিমতা ও সংগোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। যার ফলে স্বামী বেচারা সম্ভাব্য সব রকম দুর্ঘটনা ও অপব্যয়ের শিকার হতে পারে এবং হচ্ছেও।" (Woman, a Vindication, P.165, 166)

নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ

প্রাগুক্ত আলোচনায় আমরা পাশ্চাত্যের যৌনবিশারদ ও যৌন মনস্তত্ত্ববিদদের ধ্যান-ধারণা তুলে ধরেছি। এতে অভিব্যক্ত হয়েছে যে, পুরুষ লোক প্রকৃতিগতভাবেই একাধিক বিবাহ প্রত্যাশী। কোনো কোনো যৌন-মনস্তত্ত্ববিশারদের মতে, পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে একবিবাহ পছন্দ করলেও একই সাথে সে যৌন-বৈচিত্রও প্রত্যাশা করে। আর বৈচিত্রপ্রিয়তার সবচে' স্বাভাবিক ও সাধারণ রূপ হচ্ছে একাধিক বিবাহ প্রথা। বাস্তবে যার জীবনভিত্তিও দৃশ্যমান। অনুরূপভাবে তারাও স্বীকার করছেন যে, পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই একাধিক বিবাহপ্রবণ। যদিও এই প্রবণতার ভিত্তি রমণ-বৈচিত্রপ্রিয়তা।

এই চিন্তানায়করা জন্তু ও মানব-প্রকৃতি ছাড়া মানবেতিহাসেরও নযীর টেনে আনেন। তাঁরা বলেন—প্রতিযুগে এবং প্রতি সমাজে একাধিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। এটা বৈধ ও বিধিবদ্ধরূপে স্বীকার করা হয়েছে। এক-আধটা সমাজে যদি একবিবাহ ব্যবস্থা আইনত চালু থেকেও থাকে, জনগণ বেআইনী, অর্থনৈতিক ও কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করে কার্যত তা বাতিল করে দিয়েছে। আর এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় একাধিক বিবাহের অস্তিত্ব আইনভিত্তিক একাধিক বৈবাহিক সমাজের চাইতে কোনো অংশেই কম নয়। পুরুষরা যে প্রকৃতগতভাবেই একাধিক বিবাহপ্রবণ এটা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

এ পর্যালোচনা এমন কৃতবিদ্যদের, যারা একবিবাহ প্রথার তুখোড় সমর্থক এবং বৈবাহিক ক্ষেত্রে একবিবাহ প্রথাকে একাধিক বিবাহ অপেক্ষা উন্নততর ও আদর্শ

রূপ বলে গণ্য করে থাকেন। কিন্তু জীবজন্তু ও মনুষ্য জীবনের বিশদ পর্যবেক্ষণ, মানব-মনস্তত্ত্বের গভীর অনুধ্যান, রমণ-প্রবৃত্তির চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং বিধিবদ্ধ এক বিবাহ প্রথার চরম ব্যর্থতা তাদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য করেছে যে, একাধিক পত্নীর পাণি গ্রহণ করা মানুষের একটি স্বভাবসম্মত প্রবণতা এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করা মোটেই সম্ভবপর নয়।

এ পর্যালোচনা যদি একটু অতিরঞ্জনও ধরে নেয়া যায়—যদিও একবিবাহের সমর্থকদের পক্ষে একাধিক বিবাহের সমর্থনে অতিরঞ্জনের প্রশ্নই ওঠে না—তবু আপনি কেবল এটুকুই বলতে পারেন যে, এতে সামান্যতম অতিরঞ্জন আছে—পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনি এও বলতে পারেন না যে, পুরুষদের মধ্যে একাধিক বিবাহ প্রবণতার আদৌ অস্তিত্ব নেই। কেননা, তা হবে অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, মানব-ইতিহাস ও মানব-মনস্তত্ত্ব সবকিছু অস্বীকার করার নামান্তর।

যদি এ পর্যালোচনা সঠিক হয়-আর নিসন্দেহে একে বেঠিক প্রমাণ করা অসম্ভব—তবে প্রশ্ন হতে পারে, কোন্ পদ্ধতিটি প্রকৃতিগত, যুক্তিসম্মত, বাস্তবানুগ ও সমাজ কল্যাণকর? একাধিক বিবাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ করে দেয়া? অথবা একবিবাহ প্রথার সাথে সাথে কতিপয় শর্তাধীনে একাধিক বিবাহ প্রথাও আইনত চালু রাখা?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বে এই মৌলিক সত্যটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো প্রাকৃতিক জিনিসের গতি পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং তার ওপর কিছু শর্ত-শরায়েত ও নিয়ম-বিধিও আরোপ করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে সর্বাত্মকভাবে সংহার করা যায় না। এরূপ চেষ্টা-প্রয়াস শুধু বিফলকামই হয় না, বরং পরিণাম-ফল বিপরীতধর্মীও হয়ে থাকে। সত্যি কথা এই যে, প্রকৃতি তার বিরুদ্ধাচারীকে কস্মিনকালও ক্ষমা করে না।

মানুষের তাবৎ প্রাকৃতিক দাবীর ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে আমরা এক-একটি প্রাকৃতিক দাবী উত্থাপন করে দেখাতাম যে, এসব জিনিসের গতিধারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়া কিংবা তার ওপর কিছু শর্ত ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা গেলেও তাকে পুরাপুরি বিনষ্ট করা সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ মানুষের যৌন-বুভুক্ষার কথাই ধরা যাক। যা আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয়—একাধিক বিবাহের প্রাকৃতিক প্রবণতার সাথে সম্পর্কশীল।

মানুষ প্রাকৃতিক যৌন-বুভুক্ষু। এই বুভুক্ষা নিবারণের জন্য আপনি কিছু শর্ত-শরায়েত ও নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করতে পারেন—আর তা করা একান্তই বাঞ্ছনীয়, নতুবা এই বুভুক্ষার তাড়না বল্গাহীন হয়ে পড়ে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই ধ্বংস করে দিবে। আর এটা শুধু যৌন প্রবৃত্তির কথাই নয়, অন্ন-বিস্তর সবগুলো প্রাকৃতিক দাবীরই এই অবস্থা। আপনি যদি যৌন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বিনাশ করতে চান, তা কখনো সফলকাম হবে না। বরং তার চরম প্রতিক্রিয়া বিস্ফোরিত হবে এবং নিশেষে যৌন প্রবৃত্তির তপ্ত লাভা উদগীরণ হয়ে সমাজ-সমষ্টিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ইউরোপের খৃষ্টান পাদ্রীদের ইতিহাস আমাদের সামনে বিদ্যমান। তারা মানুষের যৌনপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ খতম করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যৌনপ্রবৃত্তি তার কিভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে History of European Morals (ইউরোপীয় নৈতিকতার ইতিহাস)-এর লেখক ই, এইচ, লেকী (E. H. Lecky) তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণতুলেধরেছেনঃ

"তেইশতম জন বিশপ ব্যভিচার এবং খোদ্ নিজের মা-বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। কন্টোবেরীর লাট পাদ্রী ১১৭১ ঈসাব্দে একই স্থানে সতেরোটি অবৈধ সন্তানের জনক হন। স্পেনের এক পাদ্রী ১১৩০ ঈসাব্দে সত্তরটি দাসী রক্ষিতা রাখেন। ১২৭৪ ঈসাব্দে হেনরী তৃতীয় সেশরের পাদ্রী ষাটটি অবৈধ সন্তান জন্ম দেন। তাছাড়া, এ কালের পাদ্রীরাও একেবারে কম যান না। তাঁদের ব্যভিচার-কাহিনীরও ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। অস্পৃশ্যদের আশ্রম আর আশ্রম ছিলো না, বরং তা ছিলো ব্যভিচার ব্যভিচার ও পাপাচারের বীভৎস আখড়া ও অবৈধ সন্তানের লীলা-ক্ষেত্র। ব্যভিচার ও পাপাচারের উন্মাদনায় মুহাররাম-গায়ের মুহাররামের বাছ-বিচারও উবে গিয়েছিলো। ফলে, স্বীয় মা-ভগ্নী থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে পাদ্রীদের জন্য বারংবার আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।..... খোদ ত্রাণকর্তাদেরই ছিলো এই অবস্থা। তাঁরাই ছিলেন সর্বাধিক দুরাচারী ও পাপিষ্ঠ।..... কিন্তু কেন? বস্তুত এ ছিলো সেই বিবাহ ব্যবস্থারই নিষেধাজ্ঞার বিষময় ফল। বিবাহের মত প্রাকৃতিক ও পবিত্র প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করাই ছিলো সমস্ত নষ্টের মূল। পানি প্রবাহের প্রাকৃতিক পথ বন্ধ করে দিলে, তা চৌবাচ্চার মধ্যে আটকে থেকে অবশ্যই দুর্গন্ধ ছড়াবে।" (History of European Morals).

আর এ অবস্থা কেবল ইউরোপেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচ্যেও—যেখানে এই বৈরাগ্যবাদের মহড়া চালানো হয়েছে, কমবেশী একই ফলাফল দেখা গিয়েছে। বিস্তারিত অবহিতির জন্য বৈরাগ্যবাদের যে কোনো ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করাই যথেষ্ট।

একাধিক বিবাহের ব্যাপারটিও প্রায় এই ধরনের। এটা এক প্রাকৃতিক প্রবণতা বই আর কিছু নয়। এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণকল্পে আপনি একটা সঙ্গত সীমারেখা টেনে দিতে পারেন। আর তা হবে অবশ্যই বাস্তবানুগ। কিন্তু আইনের মাধ্যমে যদি এই প্রবণতা নির্মূল করার প্রয়াস চলে, তা কখনো ফলপ্রসূ হবে না। এ আসক্তি তার অভিব্যক্তি ঘটাতে কোনো না কোনো পথ বের করে নেবেই, আর তা হবে একান্তই আইনানুগ ও নৈতিক পথ থেকে নিকৃষ্টতর। আর বাস্তবে এটাই ঘটেছে ও ঘটছে। পাশ্চাত্যে একবিবাহ প্রথা বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যৌন-উচ্ছৃংখলতা বাড়তে বাড়তে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। ম্যাক্স নারডান (Max Nardan) অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, "একবিবাহ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সভ্য দেশসমূহে পুরুষরা বহুবিবাহের অবস্থায়ই রয়ে গেছে। এক লাখ পুরুষের মধ্যে জোর একজন ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় বসে বলতে পারবে, সে তার গোটা জীবনে একটি মাত্র নারী ছাড়া অন্য কারো সংস্পর্শে আসেনি।" (Conventional Lies of Civilisation P. 301)

মানবেতিহাসে পাপাচারের এমন সয়লাব আর দেখা যায়নি। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, একবিবাহ প্রথা বিধিবদ্ধ হওয়া এর একমাত্র কারণ না হলেও প্রধানতম কারণ নিশ্চয়ই। কেননা, প্রাকৃতিক দাবী অপূর্ণ রাখার প্রতিক্রিয়া সর্বদা নির্মমই হয়ে থাকে।

কিন্তু কথা শুধু প্রতিক্রিয়ারই নয়। বহুবিবাহ ও মুক্ত যৌনবৃত্তির মধ্যে নৈতিক দিক ছাড়াও মস্ত পার্থক্য বিদ্যমান। বহুবিবাহ প্রথা এক মহান বিধিবদ্ধ নৈতিক দায়িত্বের মূর্ত প্রতীক। এতে স্বামীর ওপর তার সমস্ত বিবি-বাচ্চার দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। তাই কেবল সেই ব্যক্তিই একাধিক বিবাহ প্রার্থী হতে পারে, যে তার সকল দায়-দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। অপরদিকে, মুক্ত যৌনবৃত্তি পুরুষের ওপর কোনো নৈতিক ও বিধিসম্মত দায়িত্ব অর্পণ করে না। ফলে, একাধিক স্ত্রীলোকের প্রতি যার সামান্যতম আকর্ষণও আছে আর এ আকর্ষণ মূলত সব পুরুষের মধ্যেই আছে—সে তার কার্যসিদ্ধির পরই সকল দায় থেকে মুক্তি পায়। প্রখ্যাত যৌন মনস্তত্ত্ববিদ হ্যাভলাক এলিস (Havelock Ellis) বলেনঃ

"আমাদের ধারণা, আমরা যদি বহুবিবাহ প্রথার বৈধতা অস্বীকার করি, তাহলে বহুবিবাহপ্রসূত দায়-দায়িত্ব গ্রহণেও বিরত থাকতে পারবো। বহুবিবাহজাত দায়িত্ব পরিহারের পথ সুগম করে দিয়ে আমরা পুরুষকে স্বাধীন বহুগামিতায়-যদি সে

মতলববাজ হয়–উদ্বুদ্ধ করছি। এইভাবেই আমরা আমাদের অনাকাংখিত অপকর্মের মধ্যে একটি লাভজনক ক্ষেত্র রেখে দিই। আমাদের সমাজ জীবনে বহুবিবাহের কোনো আইনগত অস্তিত্ব নেই। তাই তার দায়–দায়িত্বও বিধি–বিধানের অন্তর্গত নয়। উটপাখী–এক সময় এরূপ ধারণা করা হতো–বালুর মধ্যে মাথা গুঁজে ঘটনাকে চোখ বুঁজে অস্বীকার করে। কিন্তু একটি সুবিখ্যাত প্রাণীও একই পন্থা গ্রহণ করছে। আর তার নাম মানুষ।" (Studies in the Psychology of sex, Vol. II. Part III P.P. 493, 494.)

এই মনস্তত্ত্ববিদ আরো বলেনঃ

"যৌন–বৈচিত্রপ্রিয়তা এক ধ্রুব সত্য। আমরা চাই আর না চাই, তা বাস্তবায়িত হবেই। তাকে স্বীকার করে নেয়া বা তার অনুমতি দেয়াই সুস্থতার লক্ষণ। আমাদের এও স্বীকার করতে হবে যে, আদিম যুগ অপেক্ষা সভ্য যুগেই তার আকর্ষণ বেশী।"

জেরসোন (Gerson) বলেছেন, একজন শিক্ষিত রুচিবান ব্যক্তি যেমন একজন কৃষকের মত একই প্রকার মোটা খাবারে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তেমনি কৃষাণ যুবক–যুবতীরা প্রায়ই একবিবাহে তৃপ্ত থাকলেও, অতিপরিবর্তনশীল রুচির অধিকারী শিক্ষিত সমাজ যৌন–বৈচিত্র লাভে আগ্রহী।" "(Sexual Problem Sept. 1908, P. 538)

লেকী (Lecky) ইউরোপীয় নৈতিকতার ইতিহাস (History of European Morals) গ্রন্থের শেষ ভাগে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের অভিব্যক্তি করে বলেছেন,

"নিছক দু'ব্যক্তির সম্মিলন যদিও প্রচলিত বিবাহ প্রথার বর্তমান রূপ; কিন্তু এতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয় যে, বিবাহ প্রথার এই একটি মাত্র রূপের মধ্যেই সমাজের কল্যাণ নিহিত।" (পৃঃ ৪৯৫)

"নিঃসন্দেহে একাববাহের প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা যৌন–বৈচিত্রের সর্বাধিক ব্যাপক রূপ হচ্ছে—যা মানব সভ্যতার সর্বযুগে বর্তমান ছিলো—বহুবিবাহ বা একাধিক বিবাহ প্রথা। কখনো তাকে সামাজিক ও আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, আবার কখনো নয়। কিন্তু বহু বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন ছিলো না এমনটি কখনো দেখা যায়নি।"–(পৃঃ৪৯৭)

সত্য কথা বলতে কি, আমরা একাধিক বিবাহের বিধিবদ্ধ ও নৈতিক ব্যবস্থাকে আইনত নিষিদ্ধ করে দিলেই মানুষ একাধিক বিবাহ প্রথা পরিত্যাগ করবে না। বরং তার ফলে মানুষের মধ্যে নৈতিক উচ্ছৃংখলতা ও অবৈধ বহুগামিতার পথ প্রশস্ত হবে। কারণ, এ পথ অবলম্বন করলে ব্যক্তিকে কোনো নৈতিক ও আইনগত দায়-দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয় না। আর আইনের দৃষ্টিতে তা অবৈধও নয়। পাশ্চাত্যে একাধিক বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার ফলে পুরুষের আদিম প্রবৃত্তি আরো বেড়ে গেছে এবং যৌন লালসা চরিতার্থ মানসে সম্ভাব্য সকল পথই অবলম্বন করা হচ্ছে। এর যৎকিঞ্চিত নমুনা পাওয়া যায় মিস কিলার, ডাঃ ভার্ড ও বৃটেনের যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ প্রোফিউমো'র 'এস্কান্ডালে'। এই নোংরামিতে বৃটেনের সর্বোচ্চ মহলের বড় বড় চাঁইরা পর্যন্ত জড়িত ছিলো। ডাঃ ভার্ড আত্মহত্যা করে তাদের এই কদর্য জীবনের ওপর এক স্থূল পর্দা টেনে দেন।)

জেমস হিন্টন (Jams Hinton) স্বীকার করেন যে, জবরদস্তি জারীকৃত একবিবাহ প্রথাই যৌন অনাচারের সকল অনিষ্টের মূল। এতে কলহ-কোন্দলের সৃষ্টি হয়। মেয়েদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দেহসর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সততা নৈতিক উচ্ছৃখলতায় পর্যবসিত হয়। (Nurriage Commission Report X'rayed, P. 268).

সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ সি, জি, জাং (C. G. Jung) তআর এক বইতে লিখেছেনঃ

"আফ্রিকান মিশনারীদের মাধ্যমে বহুবিবাহ প্রথা উচ্ছেদের ফলে দেহ-ব্যবসা ও পতিতাবৃত্তি অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। এক উগান্ডাতেই সাংবৎসরিক বিশ হাজার পাউন্ড যৌন-রোগ চিকিৎসায় ব্যয় হচ্ছে। আর নৈতিক পরিণতি? তা জঘন্যতম ও অবর্ণনীয়।"- (Modern man in Search of a soil)

কার্ল মার্কসের ডান হাত ও সমাজতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ তাঁর "পরিবার, ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নামক পুস্তকে একবিবাহ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এখানে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এঙ্গেলসের বক্তব্য অনেক দীর্ঘ। আমরা এখানে তার কয়েকটি উধৃতি তুলে ধরছিঃ

"একবিবাহ ব্যবস্থার সাথে সাথে পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর মধ্যে যে অবৈধ যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, হিতায়েরিজম দ্বারা মারগন (জনৈক গ্রন্থকার-এই গ্রন্থকারের মতবাদকেই এঙ্গেলস্ তাঁর পুস্তকের ভিত্তি করেছেন) তাকেই বুঝিয়েছেন।

এ কথা সবাই অবগত আছেন যে, সভ্যতার সকল স্তরে বিভিন্ন আকারে এই রীতি পল্লবিত ছিলো এবং বরাবর তা প্রকাশ্য ভ্রষ্টচারিতার রূপ পরিগ্রহ করছে।--- এটা আদিম ইন্দ্রিয়পরায়ণতারই একটি রূপ বিশেষ। কিন্তু এখন এই সুযোগ কেবল পুরুষদের জন্য একচেটিয়া। এবং বাস্তবে যদিও এটা জনগণ শুধু মেনেই নেয়নি, বরং পুরাদমে চালিয়েও যাচ্ছে, তবু সরকারী লোকেরা তার নিন্দা করছে। হিতায়েরী ব্যবস্থার এই অভিশাপে মূলত পুরুষদের কোনো ক্ষতি হয় না। আঘাতটা পড়ে গিয়ে নারীদের ওপর। তাদের সমাজ থেকে বের করে দেয়া হয়।..... কিন্তু এতে খোদ একবিবাহ ব্যবস্থার মধ্যে আরেকটি বৈপরীত্য জন্ম নেয়। স্বামীতো হিতায়েরিজমের মজা লুটে স্বীয় জীবনকে রঙিন করে তোলে, কিন্তু স্ত্রী বেচারা একাকিনী বসে বসে অশ্রুবিসর্জন দেয়। আধখানা সেব খাওয়ার পর যেমন হাতে গোটা সেব অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি বৈপরীত্যের একদিক ভিন্ন অপরদিকের অস্তিত্বও অকল্পনীয়—কিন্তু মনে হচ্ছে, পুরুষদের এ শিক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তারা এটা ভাবতো না—একবিবাহ ব্যবস্থার সাথে দুটি নবতর ব্যক্তিত্বও সমাজের পর্দায় ভেসে ওঠে (ইতিপূর্বে যার অস্তিত্ব ছিলো না)। একটি স্ত্রীর উপপতি এবং দ্বিতীয়টি ভেড়ুয়া। অর্থাৎ অসতী স্ত্রীর স্বামী।--- একবিবাহ প্রথা ও হিতায়েরিজমের সাথে সাথে অগম্যাগমনও সমাজের এক অপরিহার্য রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে—কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে—কিন্তু তা রোধ করা যায়নি-(পৃঃ ১২৮-১৩০)

"এ পর্যন্ত আমরা বিবাহের তিনটি প্রধান রূপ প্রত্যক্ষ করেছি এবং এই তিনটিই মানব-বিবর্তনের তিন বিশেষ স্তরের সাথে সম্পৃক্ত।..... সভ্য যুগে একবিবাহ-যার সাথে ব্যভিচার ও ভ্রষ্টাচার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।" -(পৃঃ১৪৫)

"আমরা কি প্রত্যক্ষ করছি না যে, বর্তমান যুগে একবিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে বৈপরীত্য সত্ত্বেও গলাগলি ভাব। উভয় একই সামাজিক অবস্থার দু'টি দিক। ব্যভিচার কি একবিবাহকে সঙ্গে না নিয়ে বিদায় হতে পারে?"-(পৃঃ-১৪৮)

এসব উধৃতি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, একাধিক বিবাহকে নিষিদ্ধ ও একবিবাহ প্রথাকে বিধিবদ্ধ করার অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে নৈতিক উচ্ছৃংখলতা, অগম্যাগমনতা ও গণিকাবৃত্তি।

একাধিক বিবাহের অনুমতি ও তার ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বিবেচনা করার সময় এ সত্যটি ভুললে চলবে না যে, একবিবাহের সাথে একাধিক বিবাহের কোনো বিরোধ নেই। একবিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং প্রচলিত থাকবে। একাধিক

বিবাহ ব্যবস্থা যতই কায়েম হোক না কেনো, একবিবাহ ব্যবস্থার অবসান অসম্ভব। অধিকাংশ লোক একবিবাহেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। কেননা, নারী জাতির সংখ্যা এত অধিক কখনোই হবে না যে, সকল পুরুষই একাধিক স্ত্রী লাভ করতে পারবে (বলা যেতে পারে, নারী জাতির স্বল্প আধিক্যের দরুন যখন মুষ্টিমেয় লোক একাধিক বিবাহের সুযোগ লাভে ধন্য হয়, তখন মুষ্টিমেয় লোক ব্যভিচারও করতে পারে। সুতরাং একবিবাহ ব্যবস্থায় ব্যাপক ব্যভিচারের আশঙ্কা অমূলক। কিন্তু ব্যভিচারকে বহু বিবাহের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। বিবাহের ফলে স্ত্রী একই স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট হয়। আর ব্যভিচারে এক নারীর সাথে বহু পুরুষের সম্পর্ক হয়। এ ছাড়া সমাজে ব্যভিচারের প্রচলন হলে বিবাহিত-অবিবাহিত সকল স্ত্রীলোকই এই নোংরামিতে জড়িয়ে পড়ে।) একাধিক স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির দায়-দায়িত্ব বহন করার সামর্থও সকল পুরুষের থাকবে না। বিরোধ একাধিক বিবাহ ও একবিবাহের মধ্যে নয়—একাধিক বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে। এ দুটির মধ্যে আপনি কোন্‌টি বজায় রাখতে এবং কোন্‌টি বিদায় করতে চান? একাধিক নারীর প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি—এই অনুরাগের কারণ আভ্যন্তরীণ হোক আর বাহ্যিক হোক, কিংবা উভয় প্রকার-একাধিক নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবেই, তা কেউ রোধ করতে পারবে না। এখন আপনি তার জন্য নৈতিক ও আইনানুগ পথ—তথা বিবাহের সুযোগ সৃষ্টি করে উভয়কে শালীন ও দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন করতে দিবেন, অথবা তাদেরকে অনৈতিকতা ও যৌন উচ্ছৃংখলতার অন্ধকূপে ঠেলে দিয়ে গোটা সমাজ জীবন পূতিগন্ধ করে তুলবেন, তা নির্ভর করে আপনার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর। একাধিক বিবাহ ব্যবস্থায় গুটিকতক লোক ফায়দা লুটে সত্য, কিন্তু ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিলে গোটা সমাজ জীবনই ক্রমাগত এই মহামারীর শিকার হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যভিচার ও পাপাচার যেমন বন্ধ হওয়া উচিত, তেমনি একাধিক বিবাহও। তবে কেনো এতদুভয়ের একটিকে আমরা বেছে নিলাম? উত্তর এই যে, গোটা মানব-ইতিহাসে এর কোনো নযীর নেই। এমন কোনো মানব গোষ্ঠীর কথা আমাদের জানা নেই, যেখানে ব্যভিচার ও বহুবিবাহ যুগপৎ আইনত নিষিদ্ধ হয়ে সফলতা লাভ করেছে। আমরা এমন সমাজ ব্যবস্থার কথা জানি, যেখানে ব্যভিচার নীতিগত ও আইনগতভাবে অমার্জনীয় অপরাধ ছিলো। কিন্তু একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিলো না। ইতিহাস সাক্ষী, সে সমাজ থেকে ব্যভিচার চির বিদায় গ্রহণ করেছিলো। একই সাথে আমরা এমন সমাজ ব্যবস্থার কথাও অবগত হয়েছি,

যেখানে একাধিক বিবাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ কিন্তু ব্যভিচার ও কদাচারের বাজার সরগরম। প্রথমোক্ত সমাজের দৃষ্টান্ত আমরা প্রথম যুগের মুসলিম সমাজে দেখতে পাই এবং শেষোক্ত সমাজের আদর্শচিত্র পাশ্চাত্য মুলুকে আমাদের সামনে বর্তমান। পাশ্চাত্য চিন্তানায়কেরা নৈতিক উচ্ছৃংখলতা ও যৌন বেলেল্লাপনার বিষময় ফল দেখে চীৎকার করে উঠছেন এবং অচিরেই এই অবস্থার পরিবর্তন কামনা করছেন। কিন্তু কিভাবে? একাধিক বিবাহের সাথে ব্যভিচারকেও আইনত নিষিদ্ধ করে? না, ব্যভিচার বন্ধ করার জন্য পুনরায় বহু বিবাহের প্রচলন ঘটিয়ে? কিন্তু বহুবিবাহের প্রতি পাশ্চাত্যের অপঘৃণা তো এক অনাবৃত সত্য।

ডঃ ম্যাকফারলেন (Macfarlane) বলেনঃ

"সামাজিক দৃষ্টিতে দেখা হোক, কিংবা ধর্মীয় দৃষ্টিতে, বহুবিবাহ প্রথা সভ্যতার উচ্চতর মানদন্ডগুলোর পরিপন্থী নয়। এ প্রক্রিয়াই অবাঞ্ছিত পাশ্চাত্য নারী সমস্যার প্রতিবিধান। যার একমাত্র বিকল্প রূপ ক্রমবর্ধমান বলাৎকারিতা, রক্ষিতাবৃত্তি ও বিপর্যস্ত কুমারিত্ব।" (The case for Polygamy)

ফ্রান্সের মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ লেবানের (Leben) মতে,

"বহুবিবাহ প্রথায়—নরনারীর মধ্যকার নৈসর্গিক সম্পর্ক–প্রত্যাবর্তন অমঙ্গলের তিরোভাব ঘটাবে। অনুরূপভাবে বলাৎকার, যৌন ব্যাধি, গর্ভপাত, বেজন্মা, নর–নারীর অসম সংখ্যাজনিত লক্ষ লক্ষ অবিবাহিত নারীর দুর্দশা, ব্যভিচার ও যৌন শত্রুতারও অবসান করতে পার।" (Marriage Commission Report X'rayed, P. 259.)

এন্থনী এম, লুডোভিসি (Anthony, M. Ludovici) বলেনঃ "সমস্যার সমাধানকল্পে একাধিক বিবাহে অগ্নিশর্মা হওয়া এবং এতদসত্ত্বেও নিজ শিশুদের দুধ পান করাতে অক্ষম মহিলাদের নিষ্কলঙ্ক মনে করা এবং একবিবাহ প্রথা উদ্ভূত ব্যভিচারের বিভীষিকাময় পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন থাকা নষ্টামি ও নেকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।" (Woman, p.p. 175, 176).

এবার আরেক দিক থেকে লক্ষ্য করুন! মানব–কীর্তির অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র। যে ব্যক্তি নির্মল নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার কর্মকুশলতার পরিচয় দৃষ্টিগ্রাহ্য। পক্ষান্তরে দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতিবাজ লোকের কাছে মহৎ কাজের আশা করা বাতুলতা মাত্র। চরিত্রহীন লোক সর্বদা স্বার্থপর। আর

স্বার্থপর লোক কখনো কর্ম-নৈপুণ্যের অধিকারী হতে পারে না। ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নে চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তায় নৈতিক পবিত্রতা অপরিহার্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতা পার্থিব উন্নতি, ভোগ-বিলাস ও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের অজুহাতে নৈতিকতার গুরুত্বকে লাপাত্তা করে দিয়েছে। ফলে, পশ্চিমা সমাজ-সমষ্টি অনৈতিক ও অসামাজিক ক্রিয়াকান্ডের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। তবে পাশ্চাত্য চিন্তানায়করা এখন নৈতিক মূল্যমান ও চারিত্রিক সততার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন।

Prostitution In the United States (যুক্তরাষ্ট্রে বেশ্যাবৃত্তি)-এর একটি উধৃতি প্রণিধানযোগ্যঃ

"তিনটি শয়তানী শক্তির প্রাদুর্ভাব আজ আমাদের পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছে। এই তিনটি শক্তি একটি নরককুন্ড তৈরি করতে মশগুল। (১) অশ্লীল সাহিত্য। এটি বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিস্ময়কর গতিতে স্বীয় নির্লজ্জতা স্ফীত করছে। (২) চলচ্চিত্র। এটি কেবল যৌন অনাচারই বাড়িয়ে তোলে না, বরং তা হাতে-কলমেও শিক্ষা দেয়। (৩) নারীদের ক্রমাবনতিশীল নৈতিক মান। যা তাদের পোশাক-আশাক, উলঙ্গপনা, ক্রমবর্ধমান ধূমপান ও পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশার আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। এই তিনটি জিনিসই আমাদের এখানে হুহু করে বেড়ে চলছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি খৃষ্টীয় সমাজ-সভ্যতার অবনতি ও বিলয়। এখনই যদি এর প্রতিরোধ না করা হয়, তবে রোম ও অন্যান্য জাতিকে যেমন এই ব্যভিচারই তাদের মদ, নারী ও নাট্যশালাসহ ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে, আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হবে।"- পৃঃ ১৩৯)

স্বনামধন্যা পদার্থ বিজ্ঞানী (Physicist) মিসেস হেডসন বলেনঃ

"আমাদের সভ্যতার দেয়াল ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছে। ভিত্তিসমূহ নড়বড়ে হয়ে গেছে। কড়িকাঠ নীচে ঝুঁকে পড়েছে। না জানি গোটা ইমারতটি কখন হুড়মুড় করে পড়ে যায়। আমরা বিগত ক'টি বছর দেখেছি, লোকেরা নিয়ম-শৃংখলার বড় একটা ধার ধারছে না। বাঁচার একটি মাত্র পথই আছে, আর তা হচ্ছে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা। কেননা, এ সভ্যতার সদস্যদের সর্বাত্মক তন্ময়তা স্বাধীন যৌনাচার, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও বেশ্যাবৃত্তি চরিতার্থের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। তাই তাদের সফল উন্নয়ন কর্মকান্ড বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আরো অনেক অমিতাচার পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন,

নারী ও পুরুষের স্ব স্ব শ্রেণীর প্রতি কামানুরাগ। মনুষ্য-কর্মশক্তির এহেন অপব্যয়-অপচয় বড়ই উদ্বেগজনক। যৌনাচারের এই রূপ-প্রকৃতি ও তার নিকৃষ্টতম ফলাফল দেখে আমাদের মনে প্রশ্ন উঁকি মারছে, একি আমাদের সভ্যতা বিনাশের আলামত? না তার কার্যকারণ? আমার মতে, এটা আলামত ও কার্যকারণ দুটোই।" [ইসলামী সমাজে নারী (উর্দু)-মওলানা সাইয়েদ জালালুদ্দীন উমরী, পৃঃ ৩২১, ৩২২]

এ হচ্ছে ঘটনার একদিক। অপরদিক হচ্ছে, যৌনাচারের বিশুদ্ধতা যতখানি গুরুত্ববহ, ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নে যতখানি প্রয়োজনীয়, ঠিক ততখানিই দুরূহ। মানুষের সবচেয়ে নাজুক ও সবচেয়ে ভয়াবহ খায়েশ হচ্ছে তার যৌন খায়েশ। একবার বে-লাগাম হয়ে গেলে সহজে বশীভূত হয় না। গোটা মানব জীবন ও গোটা সমাজ ব্যবস্থাই উলট-পালট করে দেয়। আর পুরাপুরি আয়ত্তাধীন থাকলে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে অনেক উন্নত কর্মকৌশল উপহার দেয়। এ যুগের মানুষের দুর্ভাগ্য-নিরতিশয় দুর্ভাগ্য এই যে, চৈন্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ যৌনাচারকে সংযত না করে বেজায় উত্তপ্ত ও বল্গাহীন করেছে। এই কালনাগিনী এখন গোটা মানবজাতিকেই দংশন করছে। অথচ তিরিয়াক (বিষপাথর) সংগ্রহে কেউ এগিয়ে আসছে না।

যৌনপ্রবৃত্তি সংযত করা এবং ব্যক্তি ও সমাজকে বিশুদ্ধ করার লক্ষ্যে কোনো একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বনই যথেষ্ট নয়। এ জন্য ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। আন্ত, বাহ্য, সংস্কারমূলক, আইনগত সর্বরকম কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এই প্রকল্পের বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ

(১) আল্লাহ্ ভীতি, (২) ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যমানে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন, (৩) পরিবেশ সুস্থ ও কলুষমুক্ত হওয়া, (৪) ব্যভিচার মহাপাপ ও কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হওয়া, (৫) নৈতিক ও আইনানুগ পন্থায় যৌনক্ষুধা মিটানোর সর্বাধিক সুবিধা থাকা।

আপনি যেদিক থেকেই দেখুন না কেনো, এ প্রজেক্টের কোনো একটি বিষয়ই অনাবশ্যক মনে হবে না। অন্তরে আল্লাহ্র ভয় না থাকলে আইন ও সমাজকে ফাঁকি দিয়ে অনেক অপকর্ম করা যায়—করা হয়ও। (আল্লাহ্ এবং আখিরাতের ভয়েই ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার পর আরবদেশ থেকে—যেখানে জাহিলী যুগে ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচলন ছিলো—ব্যভিচার বিদায় নিয়েছিল। একটা-আধটা ঘটনা যদি ঘটেও যেতো, তবে অপরাধীরা পুলিশ ও সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াই স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হয়ে

অপরাধ স্বীকার করতো। ব্যভিচারের শাস্তি 'সঙ্গেসার' (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু) একথা জেনেও তারা জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে ঐহিক দন্ড নিতে পীড়াপীড়ি করতো এবং নিজেদের ওপর তা প্রয়োগও করাতো।) দীনী ও নৈতিক মূল্যমান জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লে কিংবা তার ওপর বিশ্বাস কমজোর হয়ে গেলে অথবা কর্মজীবনে তার প্রভাব স্তিমিত হলে নৈতিকতা আঁকড়ে থাকা অসম্ভব হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা কদর্য হলে সচ্চিন্তা রক্ষা করা কতক্ষণ সম্ভব? ব্যভিচারকে যদি মহাপাপ জ্ঞান করা না হয়, কিংবা তাতে কোনো দন্ড পেতে না হয়, অথবা লঘুদন্ড হয়, তবে লোকে ভোগ-বিলাসের রঙিন ফানুস হাতছাড়া করবে কেনো? আদিম প্রবৃত্তির উদ্বাহু নৃত্যে যদি একটু-আধটু শাস্তি হয়ও তাতে এমন আর কি আসে-যায়।

অনুরূপ যদি সৎ ও আইনানুগ গন্ডিতে যৌন ক্ষুধা মিটানো না যায় এবং তার পরিধি ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়, তবে লোকে এই গন্ডি লংঘন করতে বাধ্য হবে। যারা মানব-প্রকৃতির তাগিদ উপেক্ষা করে নৈতিক ও বিধিবদ্ধ সীমা অহেতুক সংকুচিত করেছিলো এর দায়-দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে। এই সীমালংঘনের জন্য অপরাধীদের গুরুতর শাস্তিও দেয়া যাবে না। কেননা, সরল পথ কন্টকিত করে আপনি নিজেই তাদের অন্যায় পথে ঠেলে দিয়েছেন। অতএব, কঠোর শাস্তি অযৌক্তিক হবে। এরূপ শাস্তি ও সংবিধানের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহও বিচিত্র নয়।

পশ্চিমীদেশগুলো দুর্ভাগ্য যে, সেখানে উপরোক্ত স্কীমের এই বিষয়গুলোর একটি উপাদানও অবশিষ্ট নেই। অধর্ম ও নাস্তিকতা তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় দূর করে দিয়েছে। দীনী ও নৈতিক মূল্যমান জনমন থেকে উবে গেছে। চারিত্রিক সততা ও পবিত্রতা ঝেটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। যারা এসব মূল্যমান আঁকড়ে ধরে আছে, তারাও আড়ষ্টতায় খাবি খাচ্ছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্ম ও নৈতিকতা বিদায় নিয়েছে। পরিবেশ অশ্লীলতা ও অনৈতিকতায় বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) জটিল করা হয়েছে। একাধিক বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যিনা ও ব্যভিচার সেখানে দন্ডনীয় অপরাধ নয়। এমনকি অপরাধ ও পাপবোধও তাদের অন্তর থেকে তিরোহিত। ফলে, পাপাচার ও ব্যভিচারের এমন সয়লাব শুরু হয়েছে যে, দুনিয়া কোনো দিন কোনো জাতির মধ্যে এমনটি আর দেখেনি।

এ হচ্ছে সেইসব দেশের অবস্থা, যেখানে খৃষ্টবাদ একটি ধর্মমত হিসেবে বর্তমান ছিলো এবং এখনো আছে। যেখানে বিবাহ প্রথা খৃষ্টান গীর্জার সাথে সরাসরি

সম্পর্কযুক্ত। যে খৃষ্টান ধর্মের প্রবর্তক হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেনঃ

"তোমরা শ্রবণ করেছো, বলা হয়েছিলো, ব্যভিচার করো না। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে-ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো মেয়েলোকের প্রতি তাকাবে, সে তার অন্তরে তার সাথে ব্যভিচার করেছে। [এই তত্ত্ব কথাই হযতর মুহাম্মদ (সঃ) উপস্থাপন করেছেন এইভাবেঃ চোখের যিনা কুদৃষ্টি, কানের যিনা শ্রবণ, মুখের যিনা কথোপকথন, হাতের যিনা হস্তক্ষেপণ, পায়ের যিনা পদক্ষেপণ এবং দিল আকাংখা করে আর লজ্জাস্থান তা পূরণ করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে।-বুখারী ও মুসলিম-নিবন্ধকার] অতএব, তোমার ডানচক্ষু যদি তোমাকে বিপথগামী করে, তবে তা উপড়ে ফেলে দাও। কেননা, তোমার জন্য এটাই কল্যাণকর যে, তোমার একটি অঙ্গের বিনিময়ে তোমার সর্বাঙ্গ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে।" (মথি, পঞ্চম অধ্যায়, আয়াত-২৭,২৯)

শুধু চোখই নয়, কান, হাত, পা, দিল ও গুপ্তাঙ্গ সবই ব্যভিচারে মসিলিপ্ত হয়ে পড়েছে। এখন তারা এটাকে লজ্জারও মনে করেন না। বরং গর্ব ও আনন্দ ভরে এই পুণ্যতোয়া সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। প্রকল্পের পঞ্চশিলা ধ্বংস করার পরিণতি এছাড়া আর কি হতে পারে?

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীত পবিত্র ইসলামে এই স্কীম তার পঞ্চশিলা সমেত বিদ্যমান। ইসলাম মানবমনকে আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাসে সমৃদ্ধ এবং আখিরাতের জবাবদিহি ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয়ে ভীত বানায়। দীনী ও নৈতিক মূল্যমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করায় এবং এইসব মূল্যমানের ভিত্তিতে জীবনের সর্বাত্মক ব্যবস্থা সংগঠিত করে মানবমনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করায় যে, কেবলমাত্র এই জীবনরীতি গ্রহণ করার মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য নিহিত আর এর থেকে বিমুখ ও পরাঙ্মুখ থাকার অর্থ হচ্ছে উভয় কালের চরম ব্যর্থতা ও বিফলতা। ইসলাম তার পরিবেশ-প্রতিবেশকে যৌন অনাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখে। নোংরা গানবাদ্য, অশ্লীল বই-পুস্তক, কাম-উদ্দীপক গল্প-কাহিনী, চরিত্রবিধ্বংসী চলচ্চিত্র, নির্লজ্জকর উলঙ্গপনা, নর-নারীর অবাধ মেলামেশাকে নীতিগতভাবে হারাম ও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নৈতিকতা ও আইনের সীমারেখার মধ্যে যৌন ক্ষুন্নিবৃত্তির অধিকতর সুবিধা দান করে। নিকাহ ও তালাক ব্যবস্থাকে সহজতর এবং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে একাধিক বিবাহকে জায়িয মনে করে। যাতে করে কেউ কোনো ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কারণে

একাধিক নারীর সংস্পর্শ গ্রহণে বাধ্য হলে সে জন্য তাকে চোরাগুপ্তা পথ অবলম্বন করতে না হয়। বরং বিবাহের নৈতিক ও সাধু পথ গ্রহণ করে নিজকে ও সমাজকে যৌন বেলেল্লাপনা থেকে রক্ষা করতে পারে।

এরূপ সুন্দর প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রাম ও উত্তম সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও যে-ব্যক্তি নৈতিক সীমা-সরহদ পয়মাল করে নিজেকে ও অপরকে ব্যভিচার ও পাপাচারে প্রলুব্ধ করে, ইসলাম তার জন্য পরকালের পূর্বেই গুরুতর ঐহিক শাস্তির বিধান করেছে। যে শাস্তির কথা শ্রবণ করলে শরীর রোমাঞ্চিত ও শিউরে উঠে। অর্থাৎ অবিবাহিত নর-নারীকে একশ' দোররা এবং বিবাহিত নারী-পুরুষকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা।

এ হচ্ছে পবিত্র ও চরিত্রবান সমাজ গড়ার ইসলামী পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনায় একাধিক বিবাহের কড়িটি যথাস্থানেই রাখা হয়েছে—একটু এধার-ওধার করলেই গোটা পরিকল্পনা লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রত্যাহার করার পর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে কঠোর দন্ড বিধান অসমীচীন হবে এবং নিরেট উপদেশ-বলে তা কস্মিনকালেও রোধ করা যাবে না।

আজ শুধু পাশ্চাত্যেই নয়, প্রাচ্যেও এই স্কীমের অঙ্গসমূহ খসে পড়ছে। আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় অন্তর থেকে উবে যাচ্ছে। দীনী ও নৈতিক মূল্যমান বিলীয়মান। পরিবেশ পঙ্কিলতার আবর্তে ঘূর্ণায়মান। ব্যভিচারের স্বাধীনতা অনিরুদ্ধ। এক-আধটি মুসলিম দেশ ছাড়া দুনিয়ার কোথাও এর দন্ডবিধি কার্যকর নেই। শুধু অমুসলিম রাষ্ট্রনায়কই নয়, মুসলিম ক্ষমতাসীনরাও একে অসভ্য ও মধ্যযুগীয় বলে অভিহিত করছেন।

এ অবস্থায় পরিকল্পনার ভগ্নাংশ—একাধিক বিবাহের অনুমতি এবং নিকাহ্ ও তালাকের সুবিধাটুকুও খতম করে দেয়া কি প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে? আমরা যদি এমন কাজ করি, তবে তার পরিণতি কি দাঁড়াবে? এই নয় কি—প্রচলিত চারিত্রিক বেলেল্লাপনা আরো বেগবান হবে? যেসব লোক সদুপায়ে কামক্ষুধা মিটাতে পারার দরুন অসৎ পথে পা রাখতো না, তারা চরিত্রহীন হয়ে উঠবে এবং ভালো-মন্দ সবাই নষ্টামির পূতিগন্ধ গর্তে তলিয়ে যাবে।

একাধিক স্বামীত্ব নয় কেনো?

বলা যেতে পারে, এই যুক্তির প্রেক্ষিতে তো শুধু একাধিক পত্নীত্বই নয়, একাধিক স্বামীত্বেরও (Polyandry) অবকাশ থাকা উচিত। আপনি যদি পুরুষকে

লাম্পট্য থেকে রক্ষাকল্পে একাধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি দেন, তবে নারীকে অসতীপনা থেকে উদ্ধারহেতু একাধিক স্বামীত্ববরণ সমর্থন করছেন না কেনো?

আপাতদৃষ্টিতে এ প্রশ্ন যতই গুরুভার মনে হোক না কেনো বাস্তবে তত অর্থবহ নয়।

প্রথমত, জীবজন্তুর প্রকৃতি—আধুনিক বিদ্বজ্জনরা যার সাথে মানব-প্রকৃতির তুলনা করে থাকেন—একাধিক স্বামীত্ব অনুমোদন করে না। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে একস্ত্রী প্রথাও প্রচলিত আছে, আবার বহুস্ত্রী প্রথাও। কিন্তু বহুস্বামীত্ব প্রথার এতটুকু প্রচলননেই।

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ (Anthropologist) লেটুরনিউ (Letoourneau) বলেনঃ

"আমরা জীব-জানোয়ারের মধ্যে সাময়িক দাম্পত্য জীবনের সন্ধান পাই—যার পরিসমাপ্তিঘটলেপরুষ সর্বতোভাবে স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধনও পরিলক্ষিত হয়—বিশেষ করে পাখ-পাখালীর মধ্যে এ বন্ধনকে বিবাহ বন্ধন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু জীবজন্তুর মধ্যে কখনো একাধিক স্বামীত্বের—এক মাদী আর একাধিক নরের স্থায়ী বন্ধন—প্রচলন ছিলো কিনা তা স্পষ্ট নয়।"-

(Evolution of Marrieage and Family, P.35)

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ তাঁর "পরিবার, ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"লেটুরনিউ প্রাণী জগতের বহু তথ্য তুলে ধরে (বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ, ১৮৮৮ ঈসাব্দ) প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, জীবজন্তুর মধ্যেও পূর্ণ যৌন স্বাধীনতা একটি প্রাথমিক ও নিম্নমানের জিনিস।..... আমরা যদি স্তন্যপায়ী প্রাণীর দিকে তাকাই, তবে তাদের মধ্যে জীবনের সবগুলো রূপই দেখতে পাবো। যৌন স্বাধীনতার সাথে সাথে দলভিত্তিক বিবাহ রীতিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি নরের কয়েকটি মাদী এবং এক নরের এক মাদী রীতিও দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে একাধিক নরের সাথে এক মাদীর সম্পর্কের দৃষ্টান্ত নেই (লেটুরনিউর ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে 'সম্পর্ক' অর্থ মযবুত ও কায়েমী সম্পর্ক। সাময়িক বহুস্বামীত্ব নয়, স্বাধীন যৌন সম্পর্ক।) এটা নিছক মানুষের মধ্যেই সম্ভব ছিলো। এমনকি আমাদের নিকটতম আত্মীয় চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যেও নর-মাদী সম্পর্কের অধিকতর সম্ভাব্য রূপ বিদ্যমান। আর আমরা যদি এই চৌহদ্দিকে আরো সীমিত করে দিয়ে নিছক

মানব-সদৃশ হনুমানের কথা ধরি, তবে লেটুরনিউর মতে, কোথাও এক নর ও এক মাদী এবং কোথাও এক নর ও কয়েকটি মাদী পরিদৃষ্ট হয়।" (পৃঃ ৫৯, ৬০)

"এ থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নিসন্দেহে জীব-জগতের সাথে মানব-জগতেরও কতকটা মিল আছে। অবশ্য তা একান্ত নেতিবাচক। আমাদের জানা মতে, মেরুদন্ড বিশিষ্ট উন্নত প্রাণীর মধ্যে পরিবারের মাত্র দুটি রূপই দেখতে পাওয়া যায়। এক নর কয়েক মাদী অথবা এক নর ও এক মাদীর বন্ধন। উভয় অবস্থায় সাবালক নর বা স্বামী একটিই হতে পারে।" (পৃঃ ৬২, ৬৩)

দ্বিতীয়ত, পুরুষরা যেরূপ প্রকৃতিগতভাবে বহুস্ত্রীপ্রবণ, নারীরা তেমনটি নয়। বরং নারীরা স্বভাবতই একস্বামী প্রিয়। আর এ কারণেই মানবেতিহাসে বহুবিবাহ প্রথা সর্বযুগে, সর্বদেশে, সর্বজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিলো। কিন্তু এক নারীর একাধিক স্বামী বরণ বিরল ঘটনা। আর তাও গুটিকতক অসভ্য জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই খ্যাতনামা যৌন বিজ্ঞানী ডঃ মেরশের (Mercier) বলেছেনঃ

"পুরুষরা বহুস্ত্রীপ্রিয় হলেও নারীরা কিন্তু নৈসর্গিকভাবেই একস্বামীপ্রিয়।"-(Conduct and It's Disorders Biolosically Considered, P. 292, 293)

আরেকজন স্বনামধন্য যৌন বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড হার্টম্যান (Edward Hartman) বলেনঃ

"পুরুষের স্বাভাবিক ঝোঁক বহুপত্নীর প্রতি এবং নারীর স্বাভাবিক ঝোঁক একপতির প্রতি।"-Marriage Commission Report X'rayed, P. 209)

স্বনামখ্যাত যৌনবিদ হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis) বহুস্ত্রী প্রথা মানব সভ্যতার সর্বস্তরে প্রচলিত ছিলো বলে মন্তব্য করার পর বলেনঃ

"এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীত্ব বরণের ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম আর তার কারণও সম্যক বোধগম্য। সাধারণত একজন নারীর চেয়ে একজন পুরুষের পক্ষে অর্থনৈতিক ও আইনগত দিক থেকে নিজকে কেন্দ্র করে একটি পরিবার সংগঠনের সুযোগ অনেক বেশী। কিন্তু নারী স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবে এক উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। উপরন্তু একজন স্ত্রীর ধ্যান-কল্পনা ও মায়া-মমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তার সন্তান-সন্ততি। তাছাড়া, একজন পুরুষের জীবনযাত্রা প্রণালী বহুস্ত্রী রাখার পক্ষে যতখানি সহায়ক, একজন স্ত্রীর জীবনধারা

তার বহুস্বামী গ্রহণের ক্ষেত্রে ততখানি অনুকূল নয়।" -(Studies In The Psychology of Sex, P. 497)

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার চতুর্দশ খন্ডে 'বিবাহ' (Marriage) শীর্ষক আলোচনাধীন 'স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ প্রথা" (Polyandry) উপশীর্ষকে লেখা হয়েছেঃ

"Polyandry বলা হয়, একজন স্ত্রীলোক কর্তৃক কয়েকজন পুরুষ লোককে আইনসঙ্গত উপায়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাকে। বিবাহের যতগুলো আকার–প্রকার আছে, তন্মধ্যে এটি সবচেয়ে দুর্লভ।..... এরকম বিবাহ কোনো প্রাচীন ও আদিম (Primitive) জাতির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় না। নিছক দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ও মধ্য এশিয়ার মধ্যেই যা দেখা যায়। অবশ্য আফ্রিকার বাহিমা (Bahima) গোত্র এবং কিছু এস্কিমোদের মধ্যেও এ প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। তবে তা নেহায়েতই বিরল ঘটনা।"

স্বনামধন্য নৃতত্ত্ববিদ লেটুরনিউ (Letoourneau) বলেনঃ "স্ত্রীলোকের বহুবিবাহের ঘটনা আমাদের মধ্যে শুধু দুর্লভই নয়, নিন্দনীয়ও বটে। এটা রীতিমত অপরাধ এবং গুপ্তভাবে চলতে বাধ্য হয়। কয়েকজন পুরুষ একটিমাত্র নারীকে আইনসম্মত উপায়ে বিবাহ করবে, সবাই তাকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করবে এবং প্রকাশ্যে তা স্বীকার করতে হবে—এতে আমাদের আত্মমর্যাদায় চরমভাবে আঘাত লাগে।"– (Evolution of Marriage and Family, P. 74)

আলোচনার ইতি টানতে গিয়ে তিনি আরো পরিষ্কার ভাষায় বলেনঃ

"মোদ্দা কথা এই যে, স্ত্রীলোকের বহুস্বামী প্রথা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। তার অস্তিত্ব এতই কম, যতটা পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা ব্যাপক। তাকে পরীক্ষামূলক ও সাময়িক বিবাহের শ্রেণীভুক্ত করা উচিত।" (পৃঃ ৮৮)

এসব উধৃতি হতে নিম্নের বিষয়গুলো সম্মুখে ভেসে ওঠেঃ

(১) নারী মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিগতভাবে বহুস্বামী নয়, একস্বামীপ্রিয়।

(২) নারীর জীবন প্রণালী বহুস্বামীর স্থলে একস্বামীর সমর্থক।

(৩) অর্থনৈতিক ও আইনগত অবস্থাওবহু স্বামীর পরিবর্তে একস্বামীর পক্ষপাতী।

(৪) একাধিক স্বামীত্ববরণ বিরল ঘটনা। আর তাও কোনো কোনো অসভ্য জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(৫) নীতিগতভাবে এটা বেজায় নিন্দনীয় ও অপরাধমূলক কাজ এবং সভ্য মানুষের বিবেককে প্রচন্ড ভাবে নাড়া দেয়।

তৃতীয়ত, বিবাহ প্রথার দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশরক্ষা ও মীরাস বন্টন। এ দুটি উদ্দেশ্য একস্ত্রী ও বহুস্ত্রী উভয় প্রথায়ই অটুট থাকে। শিশুর মা-বাপ নির্দিষ্ট থাকে বলে বংশ ও মীরাসে গন্ডগোল হতে পারে না। শুধু তাই নয়, শিশুর প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানে—যা বিবাহ প্রথার আরেকটি লক্ষ্য—কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। মা শিশুর লালন-পালন করে আর বাবা তাদের খবরদারি করে।

পক্ষান্তরে বহুস্বামী প্রথায় মীরাস ও বংশের ক্ষেত্রে তালগোল পাকিয়ে যায়। এক স্ত্রীর বহুস্বামী থাকাতে বাচ্চা কার ঔরসে জন্মেছে, তা খুঁজে বার করার উপায় থাকে না। এ অবস্থায় কোনো এক ব্যক্তিকে বাপ ধরে নিয়ে শিশুর খবরদারি তার ওপর চাপিয়ে দিলে—বহুস্বামী প্রথায় এ ছাড়া উপায়ই বা কি আছে—তাতে শুধু মনকলা খাওয়াই সার হবে, বাস্তবের ফল একেবারে নাস্তি।

বলা হয়ে থাকে, বহুস্বামী প্রথায় বংশ ও মীরাস বাপ—কন্দ্রিক নয়, মা-কেন্দ্রিক। তাই বংশ ও মীরাসের গন্ডগোল অলীক কল্পনা মাত্র। ফ্রেডারিক এঙ্গলস্ বলেনঃ

"এক এক মেয়েলোকের ওপর সম্মিলিতভাবে একাধিক পুরুষের দখল চলতে লাগলো। অর্থাৎ বহুস্বামী প্রথা চালু হয়ে গেলো। তার ফল এই দাঁড়ালো যে, শিশুর মায়ের খোঁজ পাওয়া গেলেও কেউ বলতে পারতো না তার পিতা কে। তাই বংশধারা মাতা থেকে চলতো। এতে পুরুষের কোনো গুরুত্ব ছিলো না। অর্থাৎ মাতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো।"-(পরিবার, ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, পৃ ২১)

কিন্তু এ ধরনের কথা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বহুস্ত্রী প্রথা, একস্ত্রী প্রথা, বহুস্বামী প্রথা, মুক্ত যৌনাচার ও পতিতাবৃত্তি সর্ব অবস্থায়ই মাতা সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত থাকে। সুতরাং প্রশ্ন মাতৃ-নির্ধারণের নয়-পিতৃ নির্ধারণের। বহুস্ত্রী প্রথা ও একস্ত্রী প্রথা উভয় অবস্থায়ই পিতা সুস্থির ও সুনির্ণীত। অনুরূপভাবে এই উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর বংশ ও মীরাস মা-বাপ দুইজনের সাথেই সম্পৃক্ত হয়। অন্যপক্ষে, বহুস্বামীত্ব, মুক্ত যৌনাচার ও গণিকাবৃত্তিতে পিতার

সুপ্রত্যয়ন ও সুনির্ণয়ন অসম্ভব। তাই মীরাস ও বংশ পরম্পরা মাতৃ-কেন্দ্রিক হতে বাধ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্ত্রী অসতী হলে সন্তান স্বামীর না হয়ে ভিন্ পুরুষের হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং বহুস্ত্রী ও একস্ত্রী প্রথায়ও বংশ ও মীরাসের ব্যাপারে অন্যথা ঘটতে পারে- ঘটেও থাকে। আমরা এ আশংকা বা সম্ভাবনা অস্বীকার করছি না। তবে সেজন্য বহুস্ত্রী বা একস্ত্রী প্রথা দায়ী নয়। দায়ী হচ্ছে স্ত্রীর একপুরুষের স্থলে বহুপুরুষের সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া। যাকে আপনি যৌন—স্বাধীনতা বা বহুস্বামীত্বের কৃত্রিম রূপ- যা খুশী বলতে পারেন। এরূপ দুর্ঘটনা না ঘটলে সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যেতে পারে, সন্তানটি অমুক ব্যক্তির। (এরূপ সন্দেহ তো মাতার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হতে পারে। পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় হাসপাতালের নার্সরা দুটি প্রসূতির বাচ্চা বদলে দিলো। অতঃপর কোনোভাবে আবার তা উদ্‌ঘাটিত হলো।) কিন্তু বহুস্বামী প্রথায় তো খোদ্ মাও বলতে পারে না সন্তান কোন্ ব্যক্তির। এ সন্তান কি জারজ সন্তান অপেক্ষা এতটুকু ভিন্ন? এরূপ ক্ষেত্রে বংশ ও মীরাসের গোটা ব্যবস্থাই কি গোলমেলে হয়ে যায় না?

বিবাহ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরিবার সংগঠন। পরিবার সংগঠিত না হলে কিংবা উলট-পালট হয়ে গেলে বিবাহের কোনো গুরুত্ব থাকে না। বিবাহ প্রথা ও যৌন আযাদীর মধ্যে পার্থক্যই হচ্ছে পরিবার সংগঠন। বহুস্ত্রী প্রথা হোক কিংবা একস্ত্রী প্রথা উভয় অবস্থায়ই স্বামী পরিবারের অধিনায়ক আর বিবি-বাচ্চা তার কর্তৃত্বাধীন। কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন পরিচালক ও তার আনুগত্য ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি পরিবারের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য একজন কর্মকর্তা ও তার আনুগত্য অপরিহার্য। পরিবার মানুষ গড়ার এক নাজুক ও জটিল কারখানা। এই কারখানা তৈরী সুষ্ঠু না হলে মানুষ গড়ার মহৎ উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। শুধু তাই নয়, পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ ও বুনিয়াদী ইউনিট। পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলে সমাজ ও রাষ্ট্রের ধ্বংসও অনিবার্য। (কম্যুনিস্ট রাশিয়া কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের শিক্ষা অনুসারে শুরুতে বিবাহ ও পরিবার প্রথা ধ্বংস করে স্বাধীন যৌনাচার প্রতিষ্ঠার অভিযান চালিয়েছিলো। কিন্তু তারা অচিরেই বুঝতে পারলো, এ ব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মূলোৎপাটন করবে। তাই তারা এ পদক্ষেপ প্রত্যাহার করে।) কাজেই পরিবারের একজন অধিনায়ক থাকা কেবল পরিবার গঠনেই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়ও অত্যাবশ্যক।

বহুস্বামী প্রথায় একজন স্ত্রীকে কয়েকজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, একজন স্ত্রী কয়েকজন স্বামীর আনুগত্য কি করে করবে? পারিবারিক ব্যাপারে কার মতামত কার্যকর হবে? মানুষ গড়ার এই কারখানার পরিচালক কে হবে? আপনি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান দেখেছেন কি, যার পরিচালক কয়েকজন কিংবা আদৌ কোনো পরিচালকই নেই? এর চেয়ে আহাম্মকী আর কি হতে পারে?

বলা হয়ে থাকে, বহুস্বামী পদ্ধতিতে পরিচালক পুরুষ নয়, স্ত্রী। সুতরাং একটি প্রতিষ্ঠানের একাধিক পরিচালক হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পরিবারের পরিচালক একজনই হবে, আর সে হবে স্ত্রী। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেরূপ হয়ে থাকে। (মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের অধিকর্ত্রী মাতা আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের অধিকর্তা পিতা।)

কিন্তু এ কথা দুটি কারণে সঠিক নয়। প্রথমত, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছিলো প্রাক–সভ্যতা যুগে। আর তাও ছিলো নিছক ব্যতিক্রম আকারে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বর্ণ ফসল। সকল সভ্য সমাজে এই ব্যবস্থাই চালু ছিলো এবং আছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই অভ্রান্ত ও সঠিক। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ এর সাথেই সম্পৃক্ত। তবে কি আমরা বহুস্বামীত্বের মত অস্বাভাবিক পথ ধরে অসভ্য যুগে ফিরে যেতে চাই?

দ্বিতীয়ত, বহুস্বামীত্ব প্রথা হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফল। সুতরাং কেউ যদি তা গ্রহণ করতে চায়, তাকে সভ্য সমাজ ত্যাগ করতে হবে। আর যদি সে এই সভ্য সমাজে বাস করেই—যার অবকাঠামো পিতৃতান্ত্রিক পরিবার দ্বারা গঠিত—বহুস্বামীত্ব বরণ করে, তবে তাতে সমাজ–সভ্যতা তথা রাষ্ট্র ও মানবতাই শুধু অন্তসারশূন্য হয়ে পড়বে—অন্য কোনো ফায়দা হবে না।

সুবিচার প্রতিষ্ঠা

একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় দলীল হচ্ছে, এটা ইনসাফের পরিপন্থী! সতীন চাপিয়ে দিয়ে স্ত্রীর আরাম–আয়েশ হারাম করা এবং তার সন্তান–সন্ততিকে দুর্দশার কবলে ঠেলে দেয়া বেইনসাফী ছাড়া আর কি? এ যুলুম কিছুতেই বরদাশ্ত করা যায় না। এ যালিমী ব্যবস্থার যদি কোনো দিন প্রচলন থেকেও থাকে, তার কারণ ছিলো নারীর আত্মসম্বিতহীনতা ও তাদের অধিকারবোধহীনতা। এখন নারী সমাজ তাদের স্বকীয়তা ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন এবং পুরুষের

অত্যাচার-অবিচার নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং এই যালিমী ব্যবস্থার অবসান হতেবাধ্য।

এসব কচকচি রঙ্গমঞ্চ, রেডিও-টিভি, সংবাদপত্র, সাময়িকী ও সাহিত্যের মাধ্যমে জোরে-শোরে প্রচার করা হচ্ছে। আর মানবতা, সুবিচার ও অবলা নারীর হিতাকাংখীরা এই বেমক্কা যুলুম বন্ধের জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছেন। অথচ বাস্তব অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নারী সমাজের ওপর যুলুম একাধিক বিবাহ প্রথা নয়—বরং একাধিক বিবাহ বিরোধী বিধি-নিষেধ।

একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে স্বামী যদি অন্য মেয়ের সাথে ফষ্টিনষ্টি না করতো, তাহলে এ ব্যবস্থা হয়ত কিছুক্ষণের তরেও মানা যেতো। কিন্তু পূর্বেই এটা সবিস্তার আলোচিত হয়েছে যে, একাধিক বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ হওয়ার পর এ ঈপ্সিত লক্ষ্য কখনো হাসিল হয়নি—কখনো হাসিল হতে পারে না। বরং একাধিক বিবাহ ব্যবস্থা বিলোপ হওয়ার পর অবাধ যৌনবৃত্তি, গর্হিত রক্ষিতাবাজি ও কদর্য লাম্পট্যের বাজার সরগরম হয়ে ওঠে।

একাধিক বিবাহ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক উপকৃত হয়। কেননা, এর সাথে নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট। তাই তার ভালো-মন্দ প্রভাব মাত্র কয়েকটি স্ত্রী বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অবাধ যৌনবৃত্তির সাথে কোনো নৈতিক বা কানুনী যিম্মাদারীর প্রশ্ন নেই। তাই ক্রমশ সমাজের প্রায় সকল সদস্যই এই রঙিন কুহকে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে, সকল স্ত্রীলোকই যুলুমের শিকার হয়।

একাধিক বিবাহের দরুন—যদি তার নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব পালন করা হয়—কদাচিৎ কোনো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু অবাধ যৌনাচার, ব্যভিচার ও লাম্পট্যের দরুন অগণিত পরিবার ধ্বংস হয়েছে ও হচ্ছে।

একাধিক বিবাহ ব্যবস্থায় স্ত্রী তার স্বামীর আচার-ব্যবহার জানতে পারে। জানতে পারে তার সতীনের হাল-অবস্থাও। স্বামী যদি সতীনের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে, তবে স্ত্রী সমাজ ও আদালতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু অবাধ যৌনাচারে স্ত্রী জানতে পারে না তার স্বামী কোন্ কোন্ মেয়ের সাথে লাইনবাজি করছে। আর স্বামী তাদের সাথে বাস্তবে কি ধরনের আচার-ব্যবহার করছে।

এহচ্ছে হাজারো বছরের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, শর্তসাপেক্ষ বহুবিবাহে নারীর ভোগান্তি বেশী, না তার আইনগত বিধি-নিষেধে।

বেশ্যাবৃত্তি, রক্ষিতাবাজি ও অবাধ যৌনচারের ধ্বংসাত্মক পথ থেকে নারী ও সমাজকে রক্ষা করতে হলে একাধিক বিবাহের অবকাশ অবশ্যই রাখতে হবে। আর একাধিক বিবাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ করা হলে, ঐসব যালিমী ব্যবস্থা সমাজে ব্যাপকতা লাভ করবে—কিছুতেই তা রোধ করা যাবে না। কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তিই একথা বলতে পারেন না যে, এ ব্যবস্থা নারী সমাজ তথা গোটা সমাজ-সমষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না কিংবা তার কুফল ও অপকারিতা একাধিক বিবাহ অপেক্ষা এতটুকু কম।

কিন্তু এসব কথা বাদ দিলেও প্রশ্ন হচ্ছে একাধিক বিবাহে দোষটা কি? কেউ যদি একের অধিক বিবাহ করে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার বুঝিয়ে দেয়, প্রত্যেকের সাথে সুবিচার করে, তাহলে কোন্ যুক্তি, কোন্ আইন এবং কোন্ নৈতিকতার দৃষ্টিতে তাকে যালিম সাব্যস্ত করা যেতে পারে? হ্যাঁ, সে যদি তার কোনো স্ত্রীর হক আদায় না করে কিংবা তার স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার না করে, তবে অবশ্যই তা যুলুম হিসেবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু সে দোষ বহু বিবাহের নয়। একবিবাহ ব্যবস্থায়ও স্ত্রীর প্রতি যুলুম-অবিচার হয়। আল্লাহর ভয় ও নীতি-নৈতিকতার বালাই যাদের নেই, তারা তাই করে থাকে—আমাদের এ সমাজে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রীর সাথেও যে সুবিচার করা যায় আল্লাহভীরু লোকের জীবনই তার সাক্ষ্য বহন করে। অতএব, একবিবাহ ইনসাফের এবং একাধিক বিবাহ যুলুমের সমার্থক নয় মোটেই। মানুষ একস্ত্রী বা একাধিক স্ত্রীর সাথে যে আচরণ করে, সেজন্য তার একবিবাহ বা একাধিক বিবাহ দায়ী নয়—তার অন্তরমানস ও চারিত্রিক দোষ-গুণই প্রকৃত দায়ী।

বলা যেতে পারে, এসব থিউরিটিক্যাল কথাবার্তা। বাস্তব অবস্থা অতি করুণ। বহুস্ত্রীর মধ্যে সুবিচার করার লোক হাতে গনা গুটিকতক। বেশীর ভাগ লোকই একজনের প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ে অন্যের কথা বেমালুম ভুলে যায়। বাস্তব অবস্থা যখন এই, তখন কাল্পনিক দর্শন আউড়িয়ে লাভ কি? এমন এক ব্যবস্থা কেনই বা কায়েম থাকবে, যার মধ্যে যুলুমের আর্ত-চীৎকার লুক্কায়িত?

অনেক বড় বড় আইনজ্ঞও কথার মারপ্যাঁচে এরূপ মত প্রচার করে থাকেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই তার অন্তর্নিহিত রহস্য উন্মোচিত হয়। একাধিক স্ত্রীর স্বামীরা সাধারণত যুলুমবাজ হয়, এ কথা সার্ভের ভিত্তিতে কথিত নয়। পারিপার্শ্বিক দু'একটি ঘটনাদৃষ্টে লোকের মধ্যে এরূপ ধারণা পল্লবিত হয়েছে। আর আইনজ্ঞদের

কথার ভিত্তি হচ্ছে আদালতে দায়েরকৃত কিছু মামলা–মোকদ্দমা। অথচ এটা সুবিদিত সত্য, আদালতে কোনো ভালো কেস নয়, যারপরনাই খারাপ কেসই রুজু হয় মাত্র। এরূপ দু–চারটি কেসের ভিত্তিতে একাধিক বিবাহ সম্পর্কে মনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী সাধারণ কুধারণা পোষণ করা নির্বুদ্ধিতা বই কিছু নয়। এ যেন ঠিক তেমনি ব্যাপার, যেমন কেউ কোর্ট–কাছারিতে যুলুম, দুর্নীতি, গুম, খুন, মারপিটের কেস দেখে গোটা মানব জাতিকেই যালিম ও খুনী বলে আখ্যাত করলো কিংবা মানুষের চাল–চলনে প্রায়ই অন্যায় ও দুর্নীতি লক্ষ্য করে পারস্পরিক সম্পর্ক–সম্বন্ধই একদম বাতিল করে দিলো। গোটা মুসলিম জাহানেই একাধিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত। কিন্তু এই প্রচলনের ফলাফল কি? নিরপেক্ষ বিচারে নিশ্চয়ই তার চিত্র এত ভয়ঙ্কর নয়, যতটা প্রতিপক্ষের লেখনী অঙ্কন করেছে।

একাধিক স্ত্রীধারী লোক প্রায়ই স্ত্রীদের হক আদায় করে না—কিছুক্ষণের জন্য এ কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, কোনো প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য এটা কোন্ ধরনের যুক্তি যে, লোকে তার নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব পালন করছে না? এ চিন্তাধারা সঠিক হলে খোদ্ একবিবাহ তথা বিবাহ ব্যবস্থাকেই তো খতম করে দিতে হবে। কেননা, স্ত্রীর হক পুরাপুরি আদায় করে এমন লোকের সংখ্যা নেহায়েতই কম। একই অবস্থা নারীদেরও। খুব কম সংখ্যক নারীই স্বামীর হক যথাযথ পালন করতে পারে। এমতাবস্থায় গোটা বিবাহ ব্যবস্থাই কি হুমকির মুখে পতিত হয় না? অতপর ঘটনা কেবল বিবাহ পর্যন্তই সীমিত থাকছে না। এই চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকেও বিদায় জানাতে হবে। কেননা, গুটিকতক লোক ছাড়া সরকারের অধিকাংশ লোকই যুলুম, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন ও খুন–খারাবির দোষে দুষ্ট। আর বর্তমান যুগের সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের প্রভাববলয় তো আরো ব্যাপক। সুতরাং এই ধরনের পরাশক্তি যদি যুলুম–পীড়ন আরম্ভ করে দেয়, তাহলে তার পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাই বলে কি রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই খতম করে দিতে হবে?

আর ব্যাপারটা নিছক রাষ্ট্র পর্যন্তই বা সীমাবদ্ধ থাকবে কেনো? আজ মানব জীবনের এমন কোনো দিক ও প্রতিষ্ঠান নেই, যা অন্যায় ও দুর্নীতিমুক্ত। তাহলে কি এসব ছেড়ে ছুঁড়ে জঙ্গলের পথ ধরতে হবে?

প্রকৃতপক্ষে যুলুমের বহু প্রকারভেদ রয়েছে কোনো কোনো পদ্ধতি, নিয়ম ও প্রতিষ্ঠান মূলতই যুলুম সূচক। এই যুলুম–অন্যায় উচ্ছেদ করতে হলে ঐসব নিয়ম–

রীতি ও প্রতিষ্ঠানকেই খতম করতে হবে। যেমন—সূদের কারবার, ছুঁৎ-মার্গ, সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ-নিষেধাজ্ঞা, নারীর মানবাধিকার বঞ্চনা, সাদা-কালোর পার্থক্য, সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ ইত্যাদি। এসব বিধি-ব্যবস্থা মূলতই যুলুমভিত্তিক এবং এগুলোকে সমাজ থেকে একেবারেই বিলুপ্ত করে দেয়া দরকার।

নৈতিক মূল্যমান ও আইন অমান্য করাও এক ধরনের যুলুম। এ যুলুমের প্রতিকার নিশ্চয়ই নৈতিক মূল্যমান ও আইন পরিবর্তন নয়। বরং নৈতিক মূল্যমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও আইন মান্য করানোর মধ্যেই তার প্রতিকার নিহিত। আর এটা সম্ভব নিছক মন-মানসিকতার পরিবর্তন, সুস্থ সমাজ গঠন ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে। যুলুম বৈবাহিক জীবনে হোক, কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে অথবা রাজনৈতিক ময়দানে-মানসিক পবিত্রতা, সুস্থ সমাজ নির্মাণ ও সঠিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া তার মূলোচ্ছেদ অসম্ভব।

একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে-কিছু কিছু লোক যে যুলুম অত্যাচার করে থাকে, তাও এরই অন্তর্গত। এ যুলুমের কারণ একাধিক বিবাহ প্রথা নয়—সমাজেরচৈন্তিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত নৈরাজ্য। এ যুলুম তখনই দূর হতে পারে, যখন ঐসব নৈরাজ্য সংশোধনে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গৃহীত হবে। সমাজ উচ্ছৃংখল হলে একাধিক বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ করেও কোনো লাভ হবে না। যে ব্যক্তি নৈতিকতার অনুবর্তী নয়, সে একাধিক বিবাহ না করেও স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতে পারে। বিধিসিদ্ধ এক স্ত্রী রেখে বহু নারীর অবৈধ সংসর্গে চলে যেতে পারে। প্রথম স্ত্রী তালাক দিয়েও অন্য স্ত্রী বিয়ে করতে পারে। আবার তার সাথে মন ভরার পর তৃতীয় স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করতে পারে। একবিবাহ প্রথা একাজে বাধ সাধতে পারে না। রোম ল্যাণ্ডো (Rom Landau) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেনঃ

"(পাশ্চাত্যে) একব্যক্তি একই সময় দু'স্ত্রী রাখতে পারে না। কিন্তু কেউ তাকে একই বছরে দশ বিয়ে করতে বিরত রাখতে পারে না।"- (Sex, Life and Faith, P. 137)

বলা যেতে পারে, একাধিক বিবাহ প্রথা আদতেই যুলুমের উৎস। একাধিক স্ত্রীকে একই ধারায় প্রেম নিবেদন সম্ভব নয়। আর হৃদয়ের টান যদি সমান্তরাল না হয়, তবে কিভাবে আচার-আচরণ একই রকম হতে পারে? বেশক পুরুষের ঝোঁক এক স্ত্রীর প্রতি অধিক হবে। দ্বিতীয় বা ততোধিক স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে পারবে

না।' সুতরাং একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়ে সুবিচারের প্রত্যাশা না করে আদৌ অনুমতি না দেয়াই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে।

এহচ্ছে আরেক বিশিষ্ট কারণ—যার পরিপ্রেক্ষিতে বড় বড় বিদ্বজ্জনদেরও একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে যতই নীরন্ধ্র মনে হোক না কেনো, বাস্তবে তত সারগর্ভ নয়। নিসন্দেহে কোনো পুরুষ একাধিক স্ত্রীকে সমানুপাত প্রণয় করতে পারে না। কিন্তু প্রেমের অসমতাই অবিচারকে অনিবার্য করে তোলে না। মানুষের মন যদি সজাগ থাকে এবং ধর্মীয় নীতিবোধ থাকে চাঙ্গা, সমাজ যুলুম-অন্যায় সহ্য না করে, আইনের বাঁধন-কষণ শক্ত হয়, তবে প্রণয়-বৈষম্য তথা প্রণয়হীনতা সত্ত্বেও মানুষের কর্মকাণ্ড নিরপেক্ষ হবে। ব্যক্তি শুধু স্ত্রীর সাথেই নয়, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, আত্মীয়-প্রতেবেশী সবার সাথেই সম্পর্কযুক্ত, এবং প্রত্যেকের সাথেই তার সৌহার্দ-সহৃদয়তা ভিন্ন আঙ্গিক ও ভিন্ন পর্যায়ের। এতদসত্ত্বেও একজন আল্লাহভীরু চরিত্রবান ব্যক্তি সবার অধিকার রক্ষা করেন—সবার সাথে সদ্ব্যবহার করেন।

ব্যক্তির ভালোবাসা মাতা-পিতা ও স্ত্রী উভয় শ্রেণীর সাথেই জড়িত। আর এ ভালোবাসা সাধারণত অভিন্ন ও একরূপ হয় না। একান্নবর্তী পরিবারে উভয় পক্ষই ব্যক্তির পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাতা-পিতা চান তাদের ছেলে তাদেরকে অধিক ভালোবাসুক। স্ত্রী চেষ্টা করে স্বামীকে তার নিজের কুক্ষিগত করে রাখতে। ভালোবাসার এই টানা-পোড়েন বউ-শাশুড়ীতে বিরোধ বাধিয়ে দেয়। সম্পর্কের এই নাজুক ও দ্বন্দ্বসঙ্কুল অবস্থায়ও একজন আল্লাহভক্ত নেক ব্যক্তি মাতা-পিতা ও স্ত্রী উভয় পক্ষের হক আদায় করেন।

ভালোবাসা ও হৃদ্যতার এই তারতম্য অনেক সময় সেসব ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়, যাদের মধ্যে আইনগত ও নৈতিক মর্যাদা-অধিকার এক ও অভিন্ন। উদাহরণত কোনো ব্যক্তিই তার সকল পুত্র কিংবা কন্যাকে একরকম পেয়ার করেন না। তা সত্ত্বেও সকল শরীফ ও নেক পিতা তাঁর সমস্ত সন্তানের হক আদায় করেন—কারো প্রতিই কোনো যুলুম করেন না।

আরো একটি ব্যাপার চিন্তার বিষয়। আইনের শক্তি দিয়ে কি আন্তরিক মহব্বত পয়দা করা যায়? যায় কি তার অবসান ঘটানোও। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেই কি স্ত্রী তার স্বামীর অমিশ্র অন্তরের অধিকর্ত্রী হয়ে যাবে? স্বামী অন্য কোনো মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লে আইন কি তা রোধ করতে পারবে?

পাশ্চাত্যের এক বিবাহ ব্যবস্থায় নারী কি স্বামীর অবিমিশ্র ভালোবাসা লাভ করে ফেলেছে। পরকীয়া প্রেম কি তার হৃদয় থেকে অন্তর্হিত? এসব প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক হলে—আর অবশ্যই তা নেতিবাচক—একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধাচরণও নিরর্থক।

একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধাচারীরা গোটা নারী সম্প্রদায়ের দোহাই পেড়ে থাকেন। কিন্তু আসলে তাদের চিন্তাধারা প্রথম স্ত্রীর আপাতস্বার্থে নিবদ্ধ। একটু গভীরে প্রবেশ করে গোটা নারী সম্প্রদায় তথা গোটা মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণ চিন্তায় আত্মনিয়োগ করলেই তারা একাধিক বিবাহের শর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতির যথার্থতা অনুধাবনকরতেপারবেন।

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, পুরুষরা নানা ফন্দি-ফিকিরে নারীকে নিয়ত ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাদের অধিকার সম্পর্কে থেকেছে সদা নির্লিপ্ত ও নির্বিকার। ইসলাম এই যুলুম-প্রতারণার চির অবসান চায়। সাময়িক, বেআইনী ও অবৈধ সম্পর্কের গোপন দরজা চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়ে সে একই দরজা উন্মুক্ত রাখে। আর তা হচ্ছে বিবাহের নৈতিক ও মার্জিত ব্যবস্থা। অর্থাৎ পুরুষ তার একান্ত প্রণয়-ডোরে নারীকে আবদ্ধ করবে এবং তাদের অন্বিত সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবে। পুরুষ যদি পূর্ব থেকেই সস্ত্রীক হয়, তবু সে একইভাবে আরেক স্ত্রী লাভ করতে পারে। শর্ত হচ্ছে, দুই স্ত্রীর সাথেই তাকে সদ্ব্যবহার করতে হবে। দুই স্ত্রীর সন্তানকেই তার সমান চোখে দেখতে হবে। অন্যথায় তার দ্বিতীয় বিবাহ করার কোনো অধিকার নেই। অধিকার নেই ভিন্ মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যত ঝরঝরে করার। তাহলে তাকে পরকালের নির্মম শাস্তির আগেই কঠোর ঐহিক দন্ডে দণ্ডিত হতে হবে।

একটু সুস্থ মনে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, একাধিক বিবাহের এই শর্তাধীন সম্মতি নারীর ওপর যুলুমের পাহাড় চাপিয়ে দেয়, না সুবিচার-সদ্বিচার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের রাজপথ খুলে দেয়। প্রখ্যাতনাম্নী থিয়োসফিস্ট মিসেস এ্যানী বেসেন্ট (Mrs. Annie Besant) বলেনঃ

"পাশ্চাত্যে অলীক ও লোক-দেখানো একবিয়ে চালু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা দায়-দায়িত্বহীন বহুবিবাহ। যখন উপপত্নী (Mistress) দ্বারা মন ভরে যায়, তখন তাকে ঠেলে বের করে দেয়া হয়। অতপর সে নামতে নামতে পতিতায় (Women of Street) পরিণত হয়। কেননা, তার প্রথম প্রেমিক তার ভবিষ্যত-জীবনের

দায়-দায়িত্ব নেয় না। ফলে, একাধিক বিবাহের ঘরে নিরাপদ স্ত্রী ও মা না হয়ে শতগুণ বেশী নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় শহর-নগরে রাতের রাজপথে যখন আমরা হাজারো দুর্দশাগ্রস্তা নারীর জটলা দেখতে পাই, তখন আমরা নিশ্চিতরূপেই বুঝতে পারি যে, একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামকে ভর্ৎসনা করার কোনো অধিকার পাশ্চাত্যের নেই। ইযযতহানি, অবৈধ সন্তানসহ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা, আশ্রয়হীন-সহায়-সম্বলহীন হয়ে রাতের পর রাত রাস্তায় পড়ে থেকে নিশাচরের শিকার হওয়া, মাতৃ-মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে সবার ধিক্কার কুড়ানোর চাইতে একাধিক বিবাহ ব্যবস্থাধীনে জীবনযাপন করা এবং বৈধ সন্তান কোলে নিয়ে সসম্মানে এক স্বামীর ঘর করা নারীর পক্ষে অনেক বেশী উত্তম, অনেক বেশী আনন্দদায়ক এবং অনেক বেশী মর্যাদাকর।"-(Marriage Commission Report X- rayed. P.P. 273, 274)

পরিবার ও বিবাহের স্থায়িত্ব

একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ হচ্ছে এতে পারিবারিক ব্যবস্থা প্রভাবান্বিত হয়। পরিবার গঠিত হয় প্রথমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর আইনগত সম্পর্কের ভিত্তিতে। কিন্তু উভয়ের পারস্পরিক প্রেম-প্রণয় এই সম্পর্ককে আরো গাঢ় ও দৃঢ় করে। প্রেম-প্রণয়ের এই নাজুক দর্পণ দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ফলে, পরিবার-প্রাসাদও নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

বিবাহ-শাদীরও একই অবস্থা। বিবাহ শুধু পরিবারের প্রাণশক্তিই নয়, মানুষের নৈতিক জীবনেরও মূলভিত্তি। বিবাহ বন্ধন একটি নারী ও একটি পুরুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেয়-যেনো দুটি দেহে একটি প্রাণ। পুরুষ যখন আরেকটি মেয়েকে প্রণয়-ডোরে আবদ্ধ করে, তখন এই আত্মার আত্মীয়তা নিদারুণ শিথিল হয়ে পড়ে। অনেক সময় ভেঙ্গেও যায়।

এক বিবাহ ব্যবস্থায় পরিবার ও বৈবাহিক সম্পর্ক সমধিক সুদৃঢ় হয়—একথা অনস্বীকার্য। একবিবাহের সাধারণ ব্যবস্থা আমরাও পছন্দ করি। অবশ্য তার সাথে শর্তাধীনে একাধিক বিবাহ প্রথারও আমরা পক্ষপাতী। একবিবাহ ব্যবস্থায় পরিবার ও বৈবাহিক সম্পর্ক পোক্ত হয় দুটি শর্তাধীনে। এক—স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার ও মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। দুই—সমাজে অনায়াস যৌনতচার ও ব্যভিচার নিষিদ্ধ থাকা।

পুরুষ ও নারী পরস্পরের অধিকার ও হৃদয়াবেগের খেয়াল না রাখলে একাধিক বিবাহই নয়, একবিবাহ প্রথায়ও পরিবার ও বিবাহ বন্ধনের সুস্থিতি নসীব হবে না। প্রাচ্যেও একবিবাহ প্রথাই সাধারণভাবে প্রচলিত। তবু একস্ত্রী বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে খুব কম পরিবারই এমন আছে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক বর্তমান। পারিবারিক কলহ-কোন্দল ও তালাকের বহু ঘটনা এসব ঘরেও সংঘটিত হয়। এ হচ্ছে প্রাচ্যের হাল-অবস্থা। পাশ্চাত্যে যেখানে একাধিক বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ, সেখানেও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে বিবাহ ভেঙ্গে যায়, কথায় কথায় পরিবার ধ্বংস হয়। আর এসব হচ্ছে পুরুষ ও নারী তথা স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার-অজ্ঞতার অনিবার্য ফলশ্রুতি।

অনুরূপভাবে সমাজে অবাধ যৌনচর্চা ও রমণ-প্রবণতার নৈতিক ও বিধিগত অবকাশ থাকলে না বৈবাহিক ব্যবস্থার গুরুত্ব অবশিষ্ট থাকে, আর না পারিবারিক প্রথা মযবুত হতে পারে। বিধিবদ্ধ ও নৈতিক দায়িত্ব ব্যতিরেকে যৌন সম্পর্ক পাতানো সম্ভব হলে লোকেরা এই গুরুদায়িত্বভার মাথায় তুলে নিবে কেনো? আর একবার এই ভাবধারা প্রচলিত হয়ে পড়লে বিবাহ ব্যবস্থা ও পরিবার প্রথার ভিত্তিমূলই যাবে উৎপাটিত হয়ে।

কিন্তু ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, যে সমাজে একাধিক বিবাহের সমর্থন অনুপস্থিত সেখানে অবাধ যৌনাচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বিজয়-বৈজয়ন্তী ঘোষিত হয় এবং নারী-পুরুষ বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে সকলেই দুশ্চরিত্রতার এই সয়লাবে ভেসে যায়। শেষ পর্যন্ত বিধি-বিধানকেও সমাজের এই দুষ্প্রবৃত্তির সামনে পরাভব মানতে হয়। এতে পারিবারিক কাঠামো ধসে পড়ে এবং বৈবাহিক বন্ধনের গুরুত্ব-গরিমা নিশেষ হয়ে যায়। লোকে এটাকে দাকিয়ানুস আমলের (প্রাচীন আমলের) রীতিনীতি ও অস্বাভাবিক আচার-পদ্ধতি বলে ভাবতে শুরু করে। বিবাহ-বন্ধন অপেক্ষা অবাধ যৌনচর্চাকেই প্রাধান্য দেয়। অতপর এই অবাধ যৌনচর্চাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নরনারীরা আজ একজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, কাল অন্যজনের সাথে এবং পরশু ভিন্নজনের সাথে। দুনিয়ার সবচেয়ে সভ্য, শিক্ষিত ও উন্নত দেশ ইউরোপ-আমেরিকা পারিবারিক ব্যবস্থার অবনতি ও বৈবাহিক সম্পর্কের অস্থিতির নিকৃষ্টতম উদাহরণ পেশ করেছে। অথচ এসব দেশেই একবিবাহ প্রথা তীব্রভাবে প্রচলিত। পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজের অবস্থা পারিবারিক ব্যবস্থার উন্নতি ও বৈবাহিক রীতির স্থিতির দিক থেকে পশ্চিমা সমাজ থেকে অনেক ভালো। অথচ এ সমাজ অপেক্ষাকৃত কম সভ্য, কম উন্নত ও কম শিক্ষিত। এমনকি

ইসলামী ও নৈতিক দিক থেকেও তার মান অনেক নীচে নেমে গেছে। অথচ এ সমাজে একাধিক বিবাহের নৈতিক ও বিধিবদ্ধ সমর্থন বর্তমান এবং সীমিত পর্যায়ে তা কার্যকরও। কেননা, ইসলামে অবাধ যৌনচর্চা ধর্মত নিষিদ্ধ, নীতিগত গর্হিত ও আইনত কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। (যদিও এ দন্ডবিধি সউদী আরব ব্যতীত কোনো মুসলিম দেশেই প্রচলিত নেই)। পরিবার ও বিবাহ রীতির স্থায়িত্ব যদি একবিবাহের ওপর নির্ভরশীল হতো এবং একাধিক বিবাহ প্রথা পরিবার ও বিবাহ বন্ধনকে দুর্বল ও শিথিল করতো, তবে তার ফল অবশ্যই তার বিপরীত হতো, যা আমরা দু'চক্ষে দেখতে পাচ্ছিএবং ব্যাপকভাবে দেখতে পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, আসল ব্যাপার একবিবাহ ও একাধিক বিবাহ ব্যবস্থা নয়, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, নারী-পুরুষেরা পরস্পরের হক আদায় করছে কিনা এবং অবাধ যৌনচর্চা নিষিদ্ধ আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

ইসলাম একবিবাহ কিংবা একাধিক বিবাহ নয়-দু'টি জিনিসের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। একদিকে সে এমন নৈতিক, সামাজিক ও বিধানিক পন্থা অবলম্বন করে, যাতে করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের হক আদায়ে অধিকতর মনোযোগী হয় এবং হক নষ্ট করার সম্ভাবনা ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত থাকে। অন্যদিকে, সে অবাধ উন্মুক্ত যৌনচর্চার দ্বার দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করে দেয় এবং কোনো অবস্থাতেই তা অবারিত কিংবা একটি খিড়কি পর্যন্ত খুলে দিতে রাযী নয়।

বস্তুত নিয়ন্ত্রিত ও শর্তযুক্ত একাধিক বিবাহের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরিবার ও বিবাহ বন্ধন অধিকতর শক্ত ও মযবুত হওয়া। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করে একবিবাহ প্রথা প্রবর্তনে উন্মুক্ত বল্গাহীন যৌনতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে করে শুধু সমাজ-সমষ্টিই অনৈতিকতার সয়লাবে ভেসে যাবে না, বিবাহ বন্ধনের গুরুত্বও কার্যত খতম হয়ে যাবে, আর পরিবারের অবকাঠামো যাবে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে। মানব-প্রকৃতির দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল খোদা এ সত্যটি ভালো করে জানতেন বলেই তিনি মানুষের জন্য এই শাশ্বত বিধান দান করেছেন।

একাধিক বিবাহ প্রবর্তনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো কারণে একস্ত্রী দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারবে না, সে যেনো গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে অনায়াস যৌনতার মাধ্যমে নিজের ও সমাজের চরিত্র নষ্ট, বিবাহ বন্ধন শিথিল ও পরিবার প্রথার অবনতি ঘটাতে না পারে। সে বৈধ ও ভদ্র পন্থায় তার আকাংখিত পাত্রীর পাণি গ্রহণ করবে আর তা করতে গিয়ে সে তার প্রথমা স্ত্রীর অধিকার এতটুকু ক্ষুণ্ন করবে না।,

ইসলাম নিয়ন্ত্রিত ও শর্তসাপেক্ষ একাধিক বিবাহ অনুমোদন করেছে অবাধ-উন্মুক্ত যৌনাচারকে নিশর্তে বন্ধ করতে। মানুষ মানুষই—ফেরেশ্‌তা নয়। আপনি যদি তার যৌন অনাচারে লিপ্ত হওয়া পছন্দ না করেন, বিশেষত বর্তমান কামোদ্দীপক পরিবেশে, তাহলে সীমিত ও শর্তযুক্ত একাধিক বিবাহ ব্যবস্থা বলবৎ রাখতেই হবে। এছাড়া অবাধ যৌন অনাচার রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

হতে পারে, একাধিক বিবাহযুক্ত পরিবারে একবিবাহ বিশিষ্ট পরিবারের মত ততটা সুবাতাস বয় না, কিন্তু তা গুটিকয়েক পরিবারের ব্যাপার। একবিবাহ প্রথার পরিণতি তো হচ্ছে মুক্ত যৌনতার মহামারী ছড়িয়ে পড়া এবং তার ফলে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি, বিবাহ বন্ধনের গুরুত্ব-মাহাত্ম্য ও পরিবার প্রথার স্থিতি-স্থিরতা একের পর এক বিদায় নিয়ে যাওয়া।

একাধিক বিবাহ সমর্থনের সার কথা হচ্ছে, নারী ও পুরুষের কেবল সেই সম্পর্কই সঠিক ও সমর্থনযোগ্য, যা বিবাহের মাধ্যমে স্থিত হয়, যাতে পরিবারের ভিত্তি গড়ে ওঠে এবং যার ফলে মানুষ তার পরিবার-পরিজনের হক যথাযথ আদায় করতে প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া যত রকম সম্পর্ক-সম্বন্ধ আছে, তা সম্পূর্ণ অবৈধ ও আইনত দণ্ডনীয়। এরপরও কি আপনি বলবেন, ইসলাম একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়ে পরিবার ও বিবাহ বন্ধনকে দুর্বল করেছে?

প্রধান কার্যালয়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

- ৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেল গেট, ঢাকা-১২১৭
- ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী বায়তুল মোকররম, ঢাকা।
- ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
- ৫৫ খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা।